ফাহমিদ-উর-রহমান

সেকুলারিজম প্রশ্ন

জাতীয়তাবাদ
উপনিবেশ মুজতবা
কোলকাতা বঙ্গীয় মুসলি
তালাল আসাদ আনিসুজ
আব্দুর রাজ্জাক জাতীয়তা
বদরুদ্দীন উমর আহমদ ছফা
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী উপনিবেশ
বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমাজ আহমদ ছ

সেকুলারিজম প্রশ্ন

ফাহমিদ-উর-রহমান

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশন্স

প্রকাশকের কথা

সমগ্র বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটেই সেকুলারিজম একটি বহুল প্রচলিত প্রপঞ্চ। বিশেষত, ইউরোপের আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো তাদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামো হিসেবে বহুদিন ধরেই সেকুলারিজমকে ব্যবহার করে আসছে। ব্যাপারটা যে শুধু রাষ্ট্র পরিচালনায় সীমাবদ্ধ থেকেছে তা নয়; এর প্রভাব পড়েছে সাহিত্য, শিল্পকলা ও সাংস্কৃতিক আয়তনে।

বাংলা অঞ্চলে এই মতবাদের বিস্তার ঘটেছে মূলত উপনিবেশিক ক্ষমতাতন্ত্রের হাত ধরে। ব্রিটিশ শাসিত কলকাতার উনিশ ও বিশ—এই দুই শতকের নির্মিত জ্ঞানকাণ্ডের আলোকেই বাংলাদেশ তথা পূর্ববঙ্গে সেকুলারিজমের ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছে। সেইসাথে ষাটের দশকে ঢাকায় নতুন মধ্যবিত্ত সমাজের উদ্ভব এবং তাদের ক্ষমতা চর্চার আকাঙ্ক্ষা যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের রূপ ধারণ করেছিল, সেটিও সেকুলারিজমের পালাবদলে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে। ফলে বাংলাদেশে সেকুলারিজম, প্রগতিশীলতা, আধুনিকতা ও বাঙালিত্ব ইত্যাদি ধারণা মিলেমিশে প্রায় সমার্থক তাৎপর্য নিয়ে হাজির হয়েছে। এবং যারা বাংলাদেশে সেকুলারিজমকে প্রচার-প্রসার ও পরিপুষ্ট করার কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন, ঐতিহাসিকভাবে তাদের প্রত্যেকেই ছিলেন কলকাতায় উৎপাদিত জ্ঞানতাত্ত্বিক বয়ান ও ভাষ্যের প্রতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বাংলাদেশে সেকুলারিজম চর্চার এই উপনিবেশিক ও জাতীয়তাবাদী চরিত্র, এই ভূখণ্ডের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে যার ন্যূনতম যোগাযোগ নেই, তার ঐতিহাসিক ঘাত-প্রতিঘাত, রাজনৈতিক রূপান্তর এবং সাংস্কৃতিক প্রতিফলনের একটি নাতিদীর্ঘ অথচ কার্যকর পর্যালোচনা হাজির করা হয়েছে *সেকুলারিজম প্রশ্ন* বইতে।

আশা করি, বাংলাদেশের সেকুলারিজম চর্চার সংকট শনাক্তকরণ ও সমাধান প্রণয়নে বইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এই মহতী কাজ আঞ্জাম দিতে গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্সকে বেছে নেওয়ায় গ্রন্থপ্রণেতা, বিশিষ্ট চিন্তক ও গবেষক ফাহমিদ-উর-রহমানকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই। শুকরিয়া জানাই বইটির নির্মাণ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত সকল সহকর্মীর প্রতি। আমাদের আগামীর সাংস্কৃতিক রাজনীতি হোক আমাদের মাটি ও মানুষের সমান্তরাল।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা
১০ ডিসেম্বর, ২০২২

আরজ

এই বইতে বাংলাদেশের সেকুলারিজম বিষয়ে আমি সচেতন অনুসন্ধানের মাধ্যমে কতগুলো প্রশ্নের জবাব খুঁজেছি। বাংলাদেশে সেকুলারিজম বিষয়ে বহুল আলোচিত কিছু বিতর্ক আছে। এই বিতর্কগুলোর উৎসমুখ কোথায়, সেটাও এ বইতে আমি সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পর্যালোচনার ভেতর দিয়ে খুঁজে দেখার চেষ্টা করেছি। বাংলাদেশের সেকুলারিজম গুণেমানে প্রকৃতপক্ষে এ দেশের সেকুলারিজম হতে পারেনি। উনিশ শতকের কলকাতায় উদ্ভূত এবং ঢাকায় তা বারবার পুনরুক্ত ও পুনরুৎপাদিত হওয়ার ফলে এই সেকুলারিজম বাংলাদেশের মানুষের সত্যিকার প্রতিনিধিও হয়ে ওঠেনি।

এই ধরনের লেখাকে সঠিক অর্থে হয়তো গবেষণাকর্ম বলা যায় না, তবে আগামী দিনে যারা এ বিষয়ে কাজ করবেন, তাদের সামনে এসব লেখা একটা পথরেখার কাজ করবে বলে আমার বিশ্বাস।

গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্সের স্নেহাস্পদ সম্পাদক ফয়সাল আহমেদের পুনঃপুন তাগিদ ছাড়া এ লেখাগুলো এত তাড়াতাড়ি শেষ করা হয়ে উঠত না। তার প্রতি আমার মোবারকবাদ।

ফাহমিদ-উর-রহমান

ঢাকা, ২০২২

সূচিপত্র

সেকুলারিজম প্রশ্ন ১১

মুসলিম সাহিত্যসমাজ : পূর্ববঙ্গে ইসলামবিদ্বেষের সাংস্কৃতিক পটভূমি ৩১

আবদুর রাজ্জাক থেকে আহমদ ছফা : সেকুলারিজমের পালাবদল ৬১

হুমায়ুন কবির : আমাদের সেকুলার হয়ে ওঠার বিপদ ৭৯

সৈয়দ মুজতবা আলী : জাতীয়তাবাদের দোলাচল ৮৮

> The ideology of political representation in liberal democracies makes it difficult if not impossible to represent Muslims as Muslims.
> —Talal Asad

সেকুলারিজম প্রশ্ন

০১

নৃবিজ্ঞানী তালাল আসাদ হলেন জগদ্‌বিখ্যাত ইসলামবিদ মোহাম্মদ আসাদের পুত্র। পিতার মতো পুত্র সব সময় একই রকম হবেন, এমন কোনো কথা নেই। তালালও সে পথে হাঁটেননি। তবে বিদ্বান পিতার বিদ্বান পুত্র এই সিলসিলা তিনি জারি রেখেছেন।

বিশ শতকের মাঝামাঝি মোহাম্মদ আসাদ তাঁর সৃষ্টিশীল লেখালেখির ভেতর দিয়ে ইসলামের জন্য এক স্বপ্ন তৈরি করেছিলেন। এই স্বপ্ন অধরা হলেও বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমান আজও এই স্বপ্নের ভেতর দিয়ে তাদের ভবিষ্যৎকে অবলোকন করতে চায়। তালাল পিতার এই স্বপ্নের শরিক হননি। তিনি যখন গত শতকের পঞ্চাশের দশকে বিলাতে পড়াশোনা করতে যান তখন তিনি মার্কসবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠেন এবং তার লেখালেখিতে অনেক ক্ষেত্রে এই মার্কসবাদের যুক্তিগুলোর সযত্ন ব্যবহার আমরা দেখি। কমিউনিজমের পতনের পর এই নৃবিজ্ঞানী পণ্ডিতের পশ্চিমের অনেক মার্কসবাদী ভাবুকের মতোই ভাবান্তর হয়। যাদেরকে উত্তর-আধুনিকতাবাদের পথিকৃৎ মনে করা হয়। এরা পশ্চিমের জ্ঞানকাঠামোকে সমালোচনা শুরু করেন। তালালের ভেতরেও এটা আমরা দেখি। তিনি নতুন অবস্থানে এসে পশ্চিমা আধুনিকতার অন্যতম খুঁটি সেকুলারিজমকে নিয়ে আলোচনা শুরু করেন এবং এর সীমাবদ্ধতাগুলোকে চিহ্নিত করতে আরম্ভ করেন। এক্ষেত্রে উত্তর-আধুনিক ভাবুক মিশেল ফুকোর প্রভাব তার ওপর লক্ষ করা যায়।

তালাল সেকুলারিজমের ওপর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই লিখেছেন, যা অ্যাকাডেমিয়ার জগতে বেশ প্রভাবশালী হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এ বইগুলো হচ্ছে : *জিনিয়লজিস অব রিলিজিয়ন, ফরমেশনস অব সেকুলার* ও *সেকুলার ট্রানসেলেশনস*। এসব বইয়ে সেকুলারিজম সম্পর্কে তিনি আমাদের নতুন ধারণা দিয়েছেন এবং গতানুগতিক আলোচনার বাইরে সেকুলারিজমের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যগুলোকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। তার এসব আলোচনা ঠিক প্রথাগত ধর্মীয় পটভূমি থেকে আসেনি। সেকুলার জ্ঞানকাণ্ডের ভেতরে থেকেই ইউরোপে উদ্ভূত এই চিন্তা ও দর্শনের সাথে তিনি বোঝাপড়া করেছেন। একে বলা যায়—Secular critique of the secular.

তালালের এ আলোচনা ও পর্যবেক্ষণগুলোকে আমরা এভাবে সারসংক্ষেপ করতে পারি :

১. ধর্মের সাথে লড়াই করে সেকুলারিজমের পয়দা হলেও তালালের কথা হলো, সেকুলারিজমেরও ধর্মের মতো চরিত্র-বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ধর্মের যেমন উৎসব আছে, আইকন আছে, তীর্থস্থান আছে, প্রথা ও রীতি আছে সেকুলারিজমেরও একই রকম প্রথা-পদ্ধতি বর্তমান। ধর্মীয় পুরুষদের মতো সেকুলার নেতাদেরও একই রকম দেবত্ব আরোপ করা হয়। ধর্মের রীতিকে চ্যালেঞ্জ করলে ব্লাসফেমির মতো ঘটনা ঘটে। তেমনই সেকুলার রীতিকে চ্যালেঞ্জ করলে রাষ্ট্র এসে তাৎক্ষণিক টুঁটি চেপে ধরে। তালাল লিখেছেন—

> 'However, I am not persuaded that because national political life depends on ceremonial and on symbols of the sacred, it should be represented as a kind of religion-that it is enough to point to certain parallels with what we intuitively recognize as religion.'[১]

২. ইউরোপে যখন সেকুলারিজমের পয়দা হয়, তখন বলা হয়েছিল রাষ্ট্র বা গণজীবন থেকে ধর্মকে দূরে হটিয়ে দিতে পারলে নাগরিকদের ভেতরে বৈষম্য থাকবে না এবং ধর্মীয় হানাহানির পথ বিলুপ্ত হবে। কিন্তু বাস্তবে কী দেখা গেল? ইউরোপ-আমেরিকার ইতিহাস থেকে দেখছি, ধর্মীয় সন্ত্রাস রাতারাতি জাতীয় রাষ্ট্র ও উপনিবেশিক সন্ত্রাসে পরিণত হলো। সেকুলারিজম তার রিজন প্রতিষ্ঠার জন্য দেশে দেশে ঢের সন্ত্রাস করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে ফ্রিডম ও লিবার্টির সমার্থক মনে করে।

এই ফ্রিডম বা লিবার্টি যুক্তরাষ্ট্রের নিজের মতো করে বানানো লিবার্টি, সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য গ্রহণযোগ্য লিবার্টি নয়। এই লিবার্টির কেউ প্রতিবাদ করলে সে লিবার্টির শত্রু হিসেবে প্রতিভাত হয় এবং আইনি বা বেআইনি সন্ত্রাসের শিকার হয়। তালাল তাই যথার্থ লিখেছেন—

> 'A secular state does not guarantee toleration; it puts into play different structures of ambition and fear. The law never seeks to eliminate violence since its object is always to regulate violence.'[২]

৩. সেকুলারিজমের সাথে প্রায়শই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে যুক্ত করে দেখা হয়। কিন্তু কার্যত বহুক্ষেত্রে সেকুলারায়ন প্রক্রিয়ার সাথে কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা যুক্ত থাকে এবং সেকুলারিজমকে কর্তৃত্ববাদী সরকারগুলো বিরোধী মত দমনের জন্য ব্যবহার করে থাকে। তালালের কথায়—

> 'Of course, secularization has been undertaken not only by liberal democratic states but by authoritarian states, too, and this only shows how ambiguous liberal language is, how committed both types of secular state are, above all, to the definition and maintenance of modern power.'[৩]

৪. সেকুলারিস্টদের কথা হলো, রাষ্ট্রে সব নাগরিকের সহাবস্থান নিশ্চিত করতে হলে ব্যক্তি ও গণজীবনের পৃথক সীমানা থাকা চাই। কিন্তু আদতে সেকুলার রাষ্ট্র তার আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নাগরিকদের ব্যক্তি পরিসরেও হানা দিয়ে থাকে। তালালের তাই সংগত প্রশ্ন—

> 'Secularists accept that in modern society the political increasingly penetrates the personal. At any rate, they accept that politics through the law, has profound consequences for life in the private sphere. So why the fear of religious intrusion into private life?'[৪]

৫. সেকুলারিজম ধর্মের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণের তুমুল বিরোধী। এ কারণে এটি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে মানুষের ধর্মীয় আবেগ ও চিন্তাকে দমন করার চেষ্টা করে, যাতে তাদের ভাষায় অসহিষ্ণুতা মাথা চাড়া না দেয়। এক্ষেত্রে সেকুলারিজম কেন্দ্রীভূত নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার দিকেই পা বাড়ায়। পাশাপাশি তাত্ত্বিকভাবে এটিতে তার অবিশ্বাসের কথাই ঘোষণা করে।

৬. সেকুলারিজম বাক্‌স্বাধীনতার অধিকারের কথা বলে। কিন্তু এই অধিকার প্রয়োগের সময় এটি অন্যের ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত করলে তারা কিছু মনে করে না। বরং এটা যে সীমা অতিক্রমকারী ঘটনা, সেটাও তারা বিবেচনা করে না। অথচ সেকুলার রাষ্ট্র নিজেই তার নিরাপত্তার জন্য নাগরিকের বাক্ ও ব্যক্তিস্বাধীনতার সীমাকে আইন দ্বারা ছেঁটে দিতে দ্বিধা করে না।

৭. তালাল হেবারমাসের উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন আধুনিকতা ইসলামকে তার অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি নয়। তার ভাষায়–

> 'Islam cannot be a source of inspiration for the modern world because Habermas sees it as the quintessential example of a religious tradition that hasn't been able to adjust to modernity.'[৫]

তালালের এই পর্যবেক্ষণ থেকে আমরা বুঝতে পারি, সেকুলারিজম কোনো একহারা বিষয় নয়। এর মধ্যে যথেষ্ট অসংগতি, বৈপরীত্য ও জটিল চরিত্রের দিক রয়েছে। আমাদের দেশের প্রগতিশীল ও সেকুলার পণ্ডিতরা সেকুলারিজমকে শুধু ধর্ম নির্বিশেষে রাষ্ট্র ও সমাজে বৈষম্যহীনতা প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক ব্যবস্থাই মনে করেন না, তাদের কথা শুনলে বা লেখা পড়লে মনে হতে পারে, এটি ছাড়া আমাদের মুক্তির কোনো উপায় নেই। যেন এটি ছাড়া আমাদের ষোলোআনাই মিছে। কিন্তু তাদের এই ভাবনাচিন্তার সাথে প্রায়োগিক সেকুলারিজমের বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। এরা সেকুলারিজমকে আধুনিকতা, প্রগতিশীলতা, অসাম্প্রদায়িকতা আকারে হাজির করে একে যাবতীয় ধর্মান্ধতা ও মৌলবাদ মোকাবিলার এক রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে খাড়া করে। এর বিপরীতে প্রতিক্রিয়াশীলতা, সাম্প্রদায়িকতা ও মধ্যযুগীয়তার এক প্রতীকে ইসলামকে দেখানোর চেষ্টা করে। এদের কাছে সেকুলারিজম ও ইসলাম পুরোপুরি একটা বাইনারি বিষয়। অন্তত বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে সেটাই আমরা দেখি। সেকুলারিজমে সবাইকে স্পেস দেওয়ার যে একটা কথা আছে, এদের ভাবনাচিন্তায় তার স্থান নেই। এরা পুরোটাই কর্তৃত্ববাদী চিন্তাভাবনায় আক্রান্ত।

তালাল আসাদ চিন্তাভাবনার দিক দিয়ে সেকুলার। তিনি তার প্রাতঃস্মরণীয় পিতার রাজনৈতিক চিন্তাকে গ্রহণ করেননি। এমনকি তার মায়ের ঐতিহ্যবাদী ইসলামের শান্তিবাদী ধারাকেও এক উদাসীনতার চোখ দিয়ে দেখেছেন।

কিন্তু তিনি মোটেই ইসলামোফোবিক নন। সেকুলারিজম বিষয়ে বোঝাপড়া করতে গিয়ে তিনি ইসলামের ওপর সেকুলারিজম যে অবিচার করেছে, লেখালেখিতে তিনি তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন। একই কথা খাটে মশহুর বুদ্ধিজীবী এডওয়ার্ড সাঈদ সম্পর্কে। কমিউনিজম তার চিন্তারাজ্যেও ভালোমতো প্রভাব ফেলেছিল। আজীবন ফিলিস্তিনিদের সেকুলার জাতীয় রাষ্ট্রের পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। হামাস ও হিজবুল্লাহর ইসলামভিত্তিক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রত্যয়কে তিনি অনুমোদন করেননি। তারপরেও বলতে হবে, ইসলাম প্রশ্নে তার একটা সহানুভূতি ছিল।

সেকুলার হলেই যে ইসলামোফোবিক হতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। তালাল বা এডওয়ার্ড সাঈদ তার বড়ো উদাহরণ। কিন্তু আমাদের এখানে সেকুলারিজম ও ইসলামোফোবিয়া একাকার হয়ে গেছে। কেন এই ইসলামবিদ্বেষ? আমরা এখন তার সুলুক সন্ধান করব।

০২

আমাদের এখানে সেকুলারিজমের বয়ান যারা নির্মাণ করেছেন, তাদের বড়ো একটা অংশ প্রগতিশীল বলে পরিচিত এবং হয় কমিউনিস্ট অথবা কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন। এ দেশে আধুনিকতা, প্রগতিশীলতা কিংবা কমিউনিজমের চর্চা— যাই বলি না কেন, কোনো সেকুলার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে হয়নি এটা ঐতিহাসিক সত্য। কলোনির যুগে কলকাতার এলিট হিন্দুদের ঔরসে এবং ব্রিটিশদের ব্যবস্থাপনায় যে বেঙ্গল রেনেসাঁর পত্তন হয়েছিল, সেটাকে অনেকে এ দেশে আধুনিকতা বলে স্তব করলেও এটা কোনো সেকুলার ঘটনা ছিল না।

বেঙ্গল রেনেসাঁর ভেতর দিয়ে যে রাজনীতি ও সংস্কৃতি তৈরি হলো, তার কোনো জাতীয় পরিচয় তৈরি হয়নি। হিন্দুদের হেজিমনি আকারে সেদিন যে রাজনীতি বা সংস্কৃতি খাড়া হলো, সেখানে বাংলাভাষীদের বড়ো শরিক বাঙালি মুসলমানের যেমন জায়গা হলো না, তেমনি তাদের ভাষা ও সংস্কৃতিও পরিত্যাজ্য হয়ে রইল। সেই কালে বাঙালি মানে দাঁড়াল হিন্দু জাতির সমার্থক। তার মানে যাহা হিন্দু তাহাই বাঙালি। এ কথার সহজ মানে দাঁড়াল মুসলমানরা কেউ বাঙালি নন। বেঙ্গল রেনেসাঁ নামের এই হিন্দুত্ববাদী প্রকল্প সেদিন বাঙালির সংজ্ঞা তৈরি করল। এই এথনিক বাঙালিত্ব যারা মেনে নিতে চাইল না বা এই বাঙালিত্বকে যারা চ্যালেঞ্জ করল, তাদেরকে বলা হলো সাম্প্রদায়িক। আর যারা এই হিন্দুত্ববাদী বাঙালি প্রকল্পের অংশীদার হলো, তাদেরকে বলা হলো অসাম্প্রদায়িক, উদার ও প্রগতিশীল। লক্ষ করার বিষয় হচ্ছে, বাঙালি মুসলমানের শিরে সেই থেকে এই সাম্প্রদায়িকতার তকমাটা আজও জুড়ে আছে।

বেঙ্গল রেনেসাঁর হিন্দুত্ববাদী প্রকল্প প্রথমবারের মতো ধাক্কা খায় ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময়। বঙ্গভঙ্গ কায়েমের পর কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু এলিটরা ভয় পেয়ে যায় এই ভেবে যে, পূর্ববঙ্গে তাদের জমিদারি আধিপত্য তছনছ হয়ে যেতে পারে এবং ঢাকাকেন্দ্রিক বাঙালি মুসলমানদের কলকাতার সমান্তরাল ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখে। এটাই কলকাতা সহ্য করতে পারেনি। সেখানকার হিন্দু এলিটরা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের ফ্যান্টাসি শুরু করে। এই সশস্ত্র লড়াইয়ের নেতৃত্ব দেয় 'অনুশীলন' ও 'যুগান্তরে'র মতো দুটো গ্রুপ।

অনুশীলন ও যুগান্তর ছিল হিন্দু এলিট ও জমিদারদের স্বার্থের লোক। এখন বলা হচ্ছে, এরা নাকি স্বাধীনতার লড়াই করেছিল। অথচ এর আগে বাঙালি হিন্দুরা কোনোদিন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে একটা ঢিলও ছোড়েনি। নিজেদের জমিদারি আধিপত্য ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কা থেকেই তারা এই সশস্ত্র উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু সশস্ত্র উদ্যোগ নিলেই সেটা যে বিপ্লবী হয়ে যাবে অথবা জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন হবে, এমন কোনো কথা নেই। অত্যাচারী জমিদারদের স্বার্থের আন্দোলন কীভাবে স্বদেশি আন্দোলন কিংবা সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী আন্দোলন হয়? এটা ছিল নিছক কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু এলিটদের স্বার্থের পক্ষের হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন।

বাঙালি হিন্দুরা উপায়ান্তর না দেখে সে সময় বাঙালিত্বের নামে বাঙালি মুসলমানদের কাছে ডাকার চেষ্টা করেন। রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে তারা 'রাখীবন্ধন' আর 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গান গেয়ে গেয়ে জাতীয় ঐক্যের ধুয়া তোলেন। কিন্তু বেঙ্গল রেনেসাঁর প্রকল্প তো ইতঃপূর্বে বাঙালির জাতীয় ঐক্যের পিঠে শেষ পেরেক ঠুকে দিয়েছিল। তাই মুসলমানরা সেদিন রবীন্দ্রনাথের গানের আহ্বানে সাড়া দিতে পারেনি।

বহুদিন পর রবীন্দ্রনাথ যখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকারীদের সাথে সংশ্রব ত্যাগ করে এই আন্দোলনের পরিণাম পর্যালোচনা করতে বসেন, তখন তার মনে এই প্রশ্নটা উদিত হয়—কেন এত বড়ো আন্দোলন মুসলমান সমাজকে নাড়া দিতে পারল না? তিনি যখন কালান্তরের বিখ্যাত লেখাগুলো লিখেছেন, তখন হিন্দু-মুসলিম সমস্যাটা গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। হিন্দুর জাতপাতের রাজনীতি মুসলমান সমাজকে দূরে ঠেলে দিয়েছে, এটা তিনি হয়তো কিছুটা বুঝতে পেরেছিলেন।

মজার ব্যাপার হলো, জমিদারদের বানানো অনুশীলন ও যুগান্তর পার্টি পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টিতে বিলীন হয়ে যায়। তার মানে অনুশীলন ও যুগান্তর দলের সাচ্চা সাম্প্রদায়িক কর্মীদের হাতে এ দেশে কমিউনিস্ট পার্টির পত্তন হয়। কমিউনিস্ট পার্টিতে এরা যোগদান করলেন বটে, কিন্তু এদের মনের সাম্প্রদায়িক কাঠামোটা তারা কখনো ত্যাগ করতে পারেনি। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, এভাবে এ দেশের কমিউনিস্ট পার্টি বেঙ্গল রেনেসাঁর হিন্দুত্ববাদী প্রকল্প হিসেবে যাত্রা শুরু করল। কমিউনিস্ট পার্টি তাই কখনো সেকুলার ও অসাম্প্রদায়িক হতে পারেনি; বরং সেকুলারিজমকে এরা হিন্দুত্ববাদী প্রকল্পের অংশ বানিয়ে ছাড়ল। এরা যত বেশি অসাম্প্রদায়িকতা-প্রগতিশীলতার

কথা বলে, বুঝতে হবে এটার তলায় হিন্দুত্ববাদের জামা লুকিয়ে আছে। আর এর শর্ত তৈরি হয়েছিল জমিদারদের হাতে।

বেঙ্গল রেনেসাঁর হিন্দুত্ববাদী প্রকল্প খতম হয়ে যায় পাকিস্তান কায়েমের পর। পূর্ব বাংলায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ছিল একটা বৈপ্লবিক ঘটনা। এই কারণে যে, এটা জমিদারদের অত্যাচারের অবসান ঘটিয়েছিল। কৃষক তার জমি ফিরে পেয়েছিল এবং বাঙালি মুসলমানের ভেতরে একটি মধ্যবিত্ত সমাজ তৈরির পথ সুগম হয়েছিল। বাঙালি মুসলমান যে একটা পৃথক রাষ্ট্র তৈরি করতে ভবিষ্যতে সক্ষম হবে, তার যাত্রাও এখান থেকে আরম্ভ হয়েছিল।

অথচ এ দেশের কোনো প্রগতিশীল বা কমিউনিস্ট ভাবনাচিন্তার লোকজন আজ পর্যন্ত এই বিপ্লবী ঘটনাটির যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারেননি। কারণ, পাকিস্তান উত্তরকালে যখন কমিউনিস্ট পার্টি যাত্রা শুরু করে, তখন এই পার্টির উদ্যোক্তা ছিলেন সেই হিন্দু এলিট জমিদার বা তাদের উত্তরসূরিরা। এরা দলে দলে কমিউনিস্ট পার্টিতে ঢুকে প্রগতিশীলতা ও অসাম্প্রদায়িকতার আড়ালে পাকিস্তান উত্তরকালে তারা যে সামাজিক ও রাজনৈতিক হেজিমনি হারিয়ে ফেলেছিল, তা পুনরুদ্ধারের নতুন প্রকল্প শুরু করে। ফলে বেঙ্গল রেনেসাঁ, জমিদারি শাসনের সাফাই ভাষ্য ও বয়ানটাই এরা আবার নতুন করে প্রচার শুরু করে। এই বয়ানের নাম হয় বাঙালি জাতীয়তাবাদ। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তান আমলে ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থান দেখি, তা বেঙ্গল রেনেসাঁরই নতুন পূর্ববঙ্গীয় সংস্করণ। আজকের বাংলাদেশে ইসলামবিদ্বেষের শুরু এখান থেকেই। এই বয়ান নির্মাতাদের মধ্যে আছেন বদরুদ্দীন উমর, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও আনিসুজ্জামান। আমরা এদেরকে নিয়ে এখন একটু আলোচনা করব।

০৬

বদরুদ্দীন উমর এ দেশের শীর্ষস্থানীয় মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী। তার পিতা ছিলেন বিখ্যাত মুসলিম লীগ নেতা ও ইসলাম বিষয়ে সুপণ্ডিত মরহুম আবুল হাশিম। পিতার চিন্তার সাথে উমরের চিন্তার বিস্তর তফাত। বলা চলে ১৮০° ঘোরানো। এ কারণেই আবুল হাশিম একবার বলেছিলেন, উমর আমার বায়োলজিকাল সন, ইডিয়লজিকাল সন নয়। কথাটা সর্ববাদিসম্মত সত্য। আবুল হাশিমের মতো মুসলিম লীগ নেতারা তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ভারতের মুসলমানদের কল্যাণের জন্য পাকিস্তান আন্দোলন করেছিলেন। তাদের সেই আন্দোলনের তাত্ত্বিক ভিত্তি ছিল মুসলিম জাতীয়তাবাদ।

বলাবাহুল্য, এ দেশে বদরুদ্দীন উমরই প্রথম মুসলিম জাতীয়তাবাদী আদর্শকে ধারাবাহিক ও কাঠামোগতভাবে আক্রমণ শুরু করেন এবং বাঙালি মুসলমানের কাছে এই আদর্শকে অপ্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বহীন করে তুলতে লেখালেখি আরম্ভ করেন। বদরুদ্দীন উমর এ বিষয়ে *সাম্প্রদায়িকতা*[৬] নামে একটি বই লেখেন। এ বিষয়ে তার অপর দুখানি বই হচ্ছে *সংস্কৃতির সংকট*[৭] ও *সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা*।[৮] এ বইগুলোর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় মোটামুটি একই রকম। এখানে তিনি বলতে চেয়েছেন, ভারতবর্ষে যে মুসলিম জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটেছিল তা আসলে সাম্প্রদায়িকতার নামান্তর এবং এই সাম্প্রদায়িকতার মাধ্যমে দরিদ্র-মানুষ শ্রেণিস্বার্থ উদ্ধারের কাজে জঘন্যভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। পাকিস্তান আমলে ১৯৬৬ সালে তিনি এই বই লিখে সাম্প্রদায়িকতার সব দায়দায়িত্ব পাকিস্তান তথা মুসলমানদের ওপর চাপানোর চেষ্টা করেছেন। অথচ উমরের মতো পণ্ডিতেরা জানেন আনন্দমঠ, হিন্দুমেলা, বন্দে মাতরম, শিবাজী উৎসবের রাজনীতি মুসলমানদের হাতে তৈরি হয়নি। এই রাজনীতি মুসলমানদের কোনো স্পেস দেয়নি বলেই পাকিস্তান আন্দোলন হয়েছিল।

বদরুদ্দীন উমরের *সাম্প্রদায়িকতা* বইটা পড়ে এ দেশের আরেকজন পণ্ডিত এবনে গোলাম সামাদ অবাক হয়ে লিখেছিলেন—যে ব্যক্তির পিতা ভারতে হিন্দুদের অত্যাচারে টিকতে না পেরে সপরিবারে পাকিস্তানে এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন, তার পক্ষে এ রকম একটা বই লেখা সম্ভব হলো কী করে?[৯] সামাদ সংগতভাবে প্রশ্নটা তুলেছেন। এ কাজ শুধু উমর একা করেননি। এ মিছিলের দীর্ঘ সারিতে আছেন আনিসুজ্জামান, হাবিবুর রহমান, শওকত ওসমান, হাসান আজিজুল হক, রেহমান সোবহান, কামাল হোসেনসহ আরও অনেকে। এর সাংস্কৃতিক মনস্তত্ত্বটা কী?

বেঙ্গল রেনেসাঁর যে কালচারাল বয়ান পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানরা দেখে শিখেছে : বাঙালি কারা হবে, মুসলমানের বাঙালি হতে হলে কী কী শর্ত পূরণ করতে হবে, ভাষা হিসেবে বাংলার কেমন চেহারা হবে—এই বাঙালি প্রকল্পের দীক্ষামন্ত্র ওপার থেকে যারাই এসেছেন, তারাই কমবেশি সাথে করে নিয়ে এসেছেন। একটি হিন্দু আধিপত্যের সমাজে টিকে থাকার জন্য সংস্কৃতির প্রশ্নে ওপারের বাঙালি মুসলমানদের অনেক কিছু ছাড় দিতে হয়েছে এবং ওদের বানানো শর্তে নিজেদের পরিচয় নির্মাণ করতে হয়েছে। এই প্রক্রিয়া এমন একটি দীর্ঘমেয়াদি সাংস্কৃতিক হীনম্মন্যতা তৈরি করেছে যে, ওপার থেকে চলে আসার পরও ওদের বানানো সাম্প্রদায়িকতা ও প্রগতিশীলতার শিক্ষা এরা ভুলতে পারেননি। উলটো এরা কলকাতার তৈরি করে দেওয়া সীমানার ভেতরে অবস্থান করে, নিরন্তর তাদের স্তবস্তুতি করে চলার আরেক নাম দিয়েছেন সেকুলার হওয়া।

এই কারণেই দেখি বদরুদ্দীন উমর তার সমস্ত মেধা ও পাণ্ডিত্য দিয়ে যে ইতিহাস তৈরি করলেন, তা আমাদের ইতিহাস হতে পারল না। পাকিস্তান আন্দোলনের ভেতর দিয়ে তার পিতা আবুল হাশিম ও তার দল মুসলিম লীগ জমিদারি উচ্ছেদ করে এ দেশের কৃষক-প্রজার অর্থনৈতিক জীবন পুরোপুরি বদলে দিয়েছিল, কৃষি মালিকানায় এক বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটিয়েছিল। যেকোনো কমিউনিস্টদের চোখে এটা একটা বিপ্লবী ঘটনা ছাড়া কিছু নয়। অথচ বদরুদ্দীন উমর এ রকম একটা ঘটনা নিয়ে কিছুই লিখলেন না। তিনি জীবন কাটিয়ে দিলেন ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস লিখে। পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে এ দেশের কৃষক মুক্তির ব্যাপারটা যতখানি জড়িয়ে আছে, ভাষার লড়াইয়ের সাথে তা নেই। অথচ ভাষা আন্দোলনের নীট ফলাফলটা কী? উনিশ শতকে বেঙ্গল রেনেসাঁ ভাষা ও সংস্কৃতির যে বর্ণবাদী মডেলটি খাড়া করেছিল, এই আন্দোলনের ফলে সেটিই আবার বাঙালি মুসলমানের ঘাড়ে চেপে বসেছে। এই সূত্রে আমরা আবার বেঙ্গল রেনেসাঁর সাংস্কৃতিক বয়ানটির অধীনস্থ হয়ে পড়েছি। বদরুদ্দীন উমরের ভাষাবিষয়ক কাজকর্ম ওপার থেকে আসা একজন হীনম্মন্যতাগ্রস্ত বাঙালি মুসলমানের অসহায় সাক্ষ্য ছাড়া কিছু নয়।

উমর তার আলোচনায় প্রগতি-প্রতিক্রিয়াশীলতা, সাম্প্রদায়িকতা-অসাম্প্রদায়িকতা —এই বাইনারি তত্ত্বের আলোকে সাম্প্রদায়িকতাকে বিশ্লেষণ করেন। তার চিন্তায় দেশভাগের পটভূমিতে কংগ্রেসের ঘোষিত হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সেকুলার জাতীয়তাবাদই প্রগতিশীলতা। জিন্নাহর মুসলিম স্বার্থের রাজনীতি

নিছক সাম্প্রদায়িকতা। তার ইতিহাস বিশ্লেষণের পদ্ধতি ব্যবহার করেই তো বলা যায়, অবিভক্ত ভারতে বর্ণহিন্দুরা ছিল শোষক। মুসলমানরা ছিল শোষিত। শোষিতের পক্ষ নেওয়াই তো ছিল ন্যায্য এবং সেটাই প্রগতিশীলতা। কিন্তু উমর সে পথে না গিয়ে বর্ণহিন্দুদের রাজনীতিকে বললেন অসাম্প্রদায়িকতা। ফ্রেডারিক জেমিসন উল্লিখিত আলথুসারের যে অভিযোগ ভালগার কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ছিল, তা বদরুদ্দীন উমরের ক্ষেত্রেও কি প্রযোজ্য?

উমরের *সাম্প্রদায়িকতা* বইটার রাজনৈতিক ফলাফল কিন্তু এ দেশের বাঙালি জাতীয়তাবাদের ঝুলিতেই জমা হয়েছে, যা কি না সেদিন ছিল উঠতি বাঙালি পুঁজিপতিদের জাতীয়তাবাদ। কোনো প্রকারেই প্রলেতারিয়েত শ্রেণির জাতীয়তাবাদ নয়। উমর কি এভাবে নিজের অজান্তেই বুর্জোয়া রাজনীতির ট্র্যাজিক শিকারে পরিণত হননি। এ নিয়ে কি তার কোনো আক্ষেপ আছে?

উমর তার *সাম্প্রদায়িকতা* বইয়ে ওহাবী-ফরায়েজী আন্দোলনকে বলেছেন পশ্চাৎপদ আন্দোলন, ১৮৫৭'র আজাদী আন্দোলনকে বলেছেন সামন্ত জমিদারদের লড়াই আর মুসলমান সমাজে সাম্প্রদায়িকতার কারণ হিসেবে তাদের অনগ্রসর অর্থনৈতিক অবস্থাকে দায়ী করেছেন। ভালো কথা, কিন্তু ওহাবী-ফরায়েজী আন্দোলনের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী তাৎপর্য, এদের জমিদারবিরোধী লড়াইয়ের অর্থনৈতিক কারণ, এগুলোর ব্যাখ্যা কী? ১৮৫৭'র লড়াইকে উমরের গুরু কাল মার্কস আজাদীর লড়াই বলেছিলেন। তাহলে কার ব্যাখ্যা সঠিক, উমরের না মার্কসের? মুসলমান সমাজের অনগ্রসরতা যদি সাম্প্রদায়িকতার কারণ হয়, তাহলে অগ্রসর হিন্দুসমাজে সাম্প্রদায়িকতা এলো কেন—তার ব্যাখ্যা কী?

আসলে মুসলমানের ভূমিকা প্রশ্নে পশ্চিমবঙ্গের বাবু কমিউনিস্টদের কাত করা মার্কসবাদের প্রভাবে তিনিও কাত হয়ে পড়েন। আটকে পড়েন অগ্রসরতা-অনগ্রসরতার ফাঁদে।

বদরুদ্দীন উমর যেমন মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক বানিয়েছেন, তেমনি তাদেরকে বিদেশিও বানিয়েছেন। তিনি তার সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা বইতে মুসলমানদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বলে একটি প্রবন্ধ লেখেন, যেখানে তিনি দাবি করেন—মুসলমানরা নাকি ধর্মের দোহাই দিয়ে দেশীয় ভাষা-সংস্কৃতির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল এবং আরব-ইরানের দিকে মুখ ফিরিয়েছিল। উমরের এই তত্ত্বের মধ্যে চমক থাকতে পারে, ঐতিহাসিকতা বলে তেমন কিছু নেই।

মুসলমানরা এ দেশে হাজার বছর ধরে আছে। এ দেশের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক জীবনের সাথে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। তারা কখনো বিদেশে চলে যায়নি বা বিদেশে টাকাও পাঠায়নি। এ দেশের ভালো-মন্দের সাথে তারা সব সময় জুড়ে আছে। তাহলে তারা বিদেশি হয় কোন যুক্তিতে? মুসলমান যদি বিদেশি হয় তাহলে আর্যরা কী?

উমর যে স্বদেশ-বিদেশ তত্ত্ব হাজির করেছেন, এটি তিনি নিয়েছেন ইংরেজের অভিধান ঘেঁটে। ইংরেজরা এ দেশে তাদের জবরদস্তিমূলক শাসনকে বৈধতা দেওয়ার জন্য পূর্বতন মুসলমান শাসনকে বিদেশি শাসন হিসেবে চালিয়েছিল। ইংরেজদের এই তত্ত্বই বেঙ্গল রেনেসাঁর নির্মাতারা রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করেছিল।

উমরের স্বদেশ-বিদেশ তত্ত্বকে যদি আমরা সাংস্কৃতিক অর্থে ব্যবহার করি, তাহলেও কি তাদের বিদেশি বলা যায়? উমরের মতে, মুসলমানের মন নাকি আরব-ইরানের দিকে পড়ে থাকে। আরব-ইরানে মুসলমানের ধর্ম-সংস্কৃতির কেন্দ্রগুলো অবস্থিত। ইসলাম ধর্মও ওসব দেশে উৎপত্তি হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই ওসব দেশ নিয়ে মুসলমানের আবেগ থাকবে—এতে দোষের কি আছে? বাঙালি হিন্দুর গয়া-কাশী, মথুরা-বৃন্দাবন নিয়ে কি কোনো আবেগ নেই? খ্রিষ্টানদের বেথেলহাম, ভ্যাটিকান নিয়ে টান কি কারও চেয়ে কম? এ দেশের কমিউনিস্টদের লেনিন, মাও সেতুং, চে গুয়েভারা, হোচিমিন প্রমুখকে নিয়ে উচ্ছ্বাস, উমরের পিতা আবুল হাশিমের ভাষায়—মস্কোয় বৃষ্টি হলে ঢাকায় ছাতা ধরার অভ্যাস কি দেশপ্রেমের লক্ষণ? এদের কেউ তো এ দেশের মাটির সন্তান নয়। দুঃখের সাথে বলতে হয়, উমরের সাংস্কৃতিক বিচার অত্যন্ত সংকীর্ণ।

উনিশশ ষাটের দশকে এ দেশের উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণির একাংশ কলকাতার বাংলা সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ, পয়লা বৈশাখ ইত্যাদি নিয়ে অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস দেখায়। এই উচ্ছ্বাসকেই উমর বলেছেন মুসলমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন। এটাকে উচ্ছ্বাস না বলে মতিভ্রম বলা যায়। প্রত্যেক জাতির জীবনে কখনো কখনো ইতিহাসের একটি কালপর্বে অথবা সংকট মুহূর্তে একটা যৌথ মতিভ্রমের মুহূর্ত উপস্থিত হয়। উনিশশ ষাটের দশক বাঙালি মুসলমানের জন্য এরকম একটি মতিভ্রমের কাল।

ষাটের দশকে যে সংস্কৃতির কথা বলা হলো, এটা তো বেঙ্গল রেনেসাঁর বেঁধে দেওয়া সীমার ভেতরকার সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির ক্যানভাসে বাঙালি মুসলমানের

মুখ দেখা যায় না। যেখানে বাঙালি মুসলমান নেই, সেটা তাদের সংস্কৃতি হয় কী করে? এই সংস্কৃতির বয়ানকে ষাটের দশকে কৃত্রিমভাবে ফোটানো হয়েছিল এবং এটিকে তা দিয়ে যারা বড়ো করেছিলেন, উমর তাদের একজন। এই কৃত্রিম সংস্কৃতি বাঙালি মুসলমানকে উন্মূল করেছে। এই উন্মূল সংস্কৃতির আপদ গ্রহণকে উমর বলেছেন মুসলমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন।

ষাটের দশকে উমর যতটা না মার্কসবাদী, তার চেয়ে বেশি ভাষিক জাতীয়তাবাদী। তার এই জাতীয়তাবাদ অবশ্যই ফোর্ট উইলিয়ামের তৈরি করা বাংলা ও বাঙালি সংস্কৃতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। কোনোমতেই পূর্ব বাংলার মানুষের ভাষা ও তার সংস্কৃতির গড়নের ওপর নির্ভরশীল নয়। উমরের এই ভাষিক জাতীয়তাবাদ এ দেশে মার্কসবাদের পক্ষে কতটুকু কাজে লেগেছে তা বলা শক্ত, কিন্তু বেঙ্গল রেনেসাঁর হিন্দুত্ববাদী প্রকল্পের মরা গাঙ্গে যে জোয়ার এনেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

উমরের লেখা পড়লে প্রতীয়মান হয়, বেঙ্গল রেনেসাঁর হিন্দুত্ববাদী প্রকল্প ও মার্কসবাদের খিচুড়ি দিয়ে তার চিন্তাকাঠামোটা গড়ে উঠেছে। এ কারণেই কলকাতা থেকে কাঁধে করে নিয়ে আসা সাম্প্রদায়িকতার টুলস দিয়ে তিনি উনিশ শতকের জমিদার হিন্দুদের মতো মুসলমান সমাজকে কলঙ্কিত ও শায়েস্তা করতে চেয়েছেন। এ দেশে বাম রাজনীতির গড়পড়তা চরিত্রই এটা। এটা এ দেশে এমন একটা হীনম্মন্য প্রজন্ম তৈরি করেছে, যারা নিজের ইতিহাস আর ছবি দেখে আঁতকে উঠে আর কলকাতার বর্ণবাদী চোখ দিয়ে পূর্ব বাংলার মুসলমান সমাজকে মাপতে চায়। আত্মপরিচয়ের সংশয়ে ভোগা এই অদ্ভুত প্রজন্মের নির্মম শিকার বদরুদ্দীন উমর আর তার সমস্ত প্রতিভা!

০৪

অধ্যাপক আনিসুজ্জামানকে আজকে আমরা আমাদের ভেতরে যেভাবে হাজির দেখি তা দেখে বোঝা যাবে না, এর মাঝে আরেক আনিসুজ্জামান লুকিয়ে আছেন। সেই আনিসুজ্জামানের জন্ম পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনায়। তার দাদা শেখ আবদুর রহিম ছিলেন সেই কালের একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক, যিনি বিধ্বস্ত মুসলমান সমাজের জাগরণের জন্য কলম ধরেছিলেন। তিনি ১৯০৬ সালে ঢাকার মুসলিম লীগ সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। আনিসুজ্জামানের আব্বা এ টি এম মোয়াজ্জেম ছিলেন মুসলিম লীগের নিবেদিতপ্রাণ সমর্থক। শোনা যায় পার্টিশনের পর ২৪ পরগনা ভারতের অংশে পড়লে তিনি সেখানে পাকিস্তানের পতাকা তুলে কংগ্রেস ও প্রশাসনের রোষানলে পড়েন। হিন্দুদের অত্যাচার থেকে বাঁচবার জন্য তিনি তখন পূর্ব পাকিস্তানে পাড়ি জমান।

আনিসুজ্জামান তার *আত্মস্মৃতিতে* জানিয়েছেন—স্কুলজীবন থেকেই তিনি কীভাবে পাকিস্তানপন্থি হয়ে উঠেছিলেন, স্কুলের টিফিনের টাকা জমিয়ে কীভাবে জিন্নাহ ফান্ডে মানি অর্ডার করে পাঠিয়েছিলেন, স্কুলের বন্ধুদের সাথে মিলে গান্ধীর কাছে টেলিগ্রাম করে বার্তা পাঠিয়েছিলেন—'টু মহাত্মা গান্ধী, প্লিজ অ্যাকসেপ্ট পাকিস্তান', তার এক রুদ্ধশ্বাস বর্ণনা। কীভাবে সাম্প্রদায়িক হিন্দুদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য তারা হিন্দু নাম গ্রহণ করে ট্রেনে করে পালিয়েছিলেন, পাকিস্তানই যে তাদের ভবিষ্যৎ এটা তারা নিয়তির লিখন হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন—এসব কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন।[১০]

পাকিস্তানে এসে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির শাখা প্রতিষ্ঠান যুবলীগের সাথে সম্পৃক্ত হন। সেই পথ ধরে ভাষা আন্দোলনে এবং পরে মুক্তিযুদ্ধে। পাকিস্তান বিষয়ে এমনকি ধর্ম বিষয়ে তার মোহভঙ্গ হয় এই কমিউনিস্ট পার্টির হিন্দুত্ববাদী প্রকল্পের প্রভাবে। ষাটের দশকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের কৃত্রিম ডিসকোর্স যারা ফুটিয়ে তুলেছিলেন, ইনিও ছিলেন তাদের এক নবীন অংশীদার।

তার জীবনের প্যারাডক্সিক্যাল ট্রাজেডি হলো, তিনি জিন্নাহর পাকিস্তানকে আজীবন গালমন্দ করেছেন। অথচ এখানে এসেই তার বৈষয়িক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়েছেন। এখানে এসে নাগরিক হিসেবে সমানাধিকার ও মর্যাদা পেয়েছেন। যেটা পশ্চিমবঙ্গে সম্ভব ছিল না।

এখানে প্রতিষ্ঠা লাভের পর তার মনে হয়েছে অবিভক্ত ভারতই হয়তো ভালো ছিল। নদীর ওপারের কাল্পনিক সুখভাবনা তাকে বাস্তবতাশূন্য বানিয়ে দিয়েছে। এটা কি একধরনের Migrant Psychology—মুহাজির মনস্তত্ত্ব?

এরা বুঝতে অক্ষম, অবিভক্ত ভারতে এদের সামাজিক অর্জন প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকতার বেশি কিছু জুটত না। এ কারণে সাম্প্রদায়িকতা একটা বিষয় ছিল। তার চেয়েও বড়ো বিষয় হলো, গুণেমানে যোগ্যতায় উদীয়মান মুসলমানশ্রেণি বাঙালি বর্ণহিন্দুর ধারেকাছেও ছিল না। আনিসুজ্জামানকে এসব ঐতিহাসিক-মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষিতেই বিচার করা জরুরি।

প্রথম জীবনে তিনি *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*[১১] বলে একটি বই লেখেন। এই বইতে মুসলিম সাহিত্যিকদের লেখালেখি বিশ্লেষণ করে বাঙালি মুসলমান সমাজের একটি চরিত্র-বৈশিষ্ট্য তিনি উন্মোচন করতে চেয়েছেন। এই উন্মোচনের ক্ষেত্রেও তিনি অনেক সময় কলকাতার বাটখারাই ব্যবহার করেছেন। তিনি মুসলমান সমাজকে ইতিহাসবিমুখ, প্রগতিবিমুখ, আরব-ইরানমুখী এবং হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। অথচ সেই কালে বাঙালি মুসলমান সমাজের চারপাশে যে প্রতিকূল রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক দেয়াল মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল, তার কথাটা তিনি মোটেই বিবেচনা করেননি। অন্যদিকে তার কাছে বিদ্যাসাগরের পৌরুষ, বঙ্কিমের প্রতিভা বড়োই আদরণীয় হয়ে ওঠে। পুরো উনিশ শতকজুড়ে বেঙ্গল রেনেসাঁ নামে যে উগ্র হিন্দু জাতিবাদ গড়ে ওঠে, তার নির্মাতা যে এরা—এ কথাটা তিনি বেমালুম চেপে যান। আর তাদের সাথে তুলনা করে তিনি মুসলমান মানসকে সাম্প্রদায়িক হিসেবে সাব্যস্ত করেন।

১৯৬০-এর দশক থেকে তিনি বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির এক তীব্র অনুসারী হিসেবে নিজেকে হাজির করেন। তার এই বাংলা প্রীতিরও একটা বিশেষ রূপ ছিল। বাঙালি বলতে তিনি উনিশ শতকের কলকাতাকেন্দ্রিক বর্ণবাদী ব্রাহ্মণদের নন্দনতত্ত্ব, শিল্প-সংস্কৃতি ও ইতিহাসকেই বুঝেছেন এবং কলকাতার হিন্দুয়ানি দ্বারা বাঙালি মুসলমানের ঐতিহাসিকভাবে নিপীড়িত হওয়ার ইতিহাসকে ভুলিয়ে দিয়ে কলকাতার হিন্দু বাঙালিত্বকে পূর্ব বাংলার বাঙালি জাতীয়তাবাদ বলে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। এ প্রক্রিয়াটিকেই আনিসুজ্জামান অসাম্প্রদায়িকতা, প্রগতিশীলতা, বাঙালিত্ব ও সেকুলারিজম বলে সাব্যস্ত করেছেন।

আসল কথা হলো বাঙালিত্বের পথ এত সরল ছিল না। ইতিহাসে এর অনেক চড়াই-উতরাই আছে। তা ছাড়া বাঙালিত্ব সব বাঙালিকে কখনো এক জায়গায় জড়ো করতে পারেনি। আনিসুজ্জামান তার লেখালেখিতে কলকাতার মডেলে যে বাঙালিত্ব হাজির করেন তার সাথে পূর্ব বাংলার মানুষের ইতিহাস ও সংস্কৃতির সম্পর্ক শূন্যতাই বেশি।

আসলে ভারতভাগ এবং অন্য কারণে যে মুসলিম মুহাজিররা কলকাতা থেকে ঢাকা এসেছিলেন, তারা প্রায় সকলে ঢাকাকে কলকাতার আদর্শ ও আদলে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। ফলে এখানে সৃষ্টি হয়েছে জাতি ও সংস্কৃতি পরিচয়ের বড়ো সংকট, যা ঢাকার বর্তমান দুর্দশার জন্য দায়ী। এই মুসলিম বাঙালি তরুণরা ছিলেন বেঙ্গল রেনেসাঁর লাস্ট বেঞ্চার। কলকাতার নবজাগরণ থেকে বঞ্চনার বোধ তাদের পীড়িত করেছে। কিন্তু ঢাকায় সেই নবজাগরণের যেমন দিশা মেলেনি, তেমনি কলকাতার মুখোমুখি ঢাকার সাংস্কৃতিক বিকাশও যথেষ্ট মানসম্পন্ন হয়নি। ফলে এই তরুণরা ঢাকায় বসে কলকাতার সাধনা করতে গিয়ে এক গভীর হীনম্মন্যতার খাদে পড়ে গেছে, যা তাদের ও আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক জগতের প্রধান ট্রাজেডি। শহীদুল্লাহ, বদরুদ্দীন উমর, আনিসুজ্জামান, শওকত ওসমান, হাবিবুর রহমান, হাসান আজিজুল হক– এরা কেউই ব্যতিক্রম নন। এই মুহাজির সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা মূলত ঢাকায় আটকে পড়া কলকাতার বাঙালি।

অন্যদিকে বেঙ্গল রেনেসাঁর হিন্দুত্ববাদী প্রকল্পের সাথে এপারে যারা হাত মিলিয়েছেন, তাদের সংখ্যাও কম নয়। আবদুল হক, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আবদুল্লাহ আবু সাঈদ প্রমুখ। সাংস্কৃতিক চিন্তার দিক দিয়ে এরা নিজভূমে পরবাসী, এপারের হয়েও এপারের নয়।

০৫

ইংরেজি ভাষার অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর পক্ষপাতিত্ব কমিউনিজমের দিকেই। জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, সমাজতন্ত্র প্রভৃতিকে কেন্দ্র করেই তার লেখাজোখা ছড়িয়েছে বেশি। রাষ্ট্রের কথা ধরলে বাঙালির জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই তার স্বপ্ন। এ কারণে ইতিহাস ব্যাখ্যায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রগতিশীলতার কথা বারবার তিনি তুলে ধরেন। যদিও ইতিহাসের বিবেচনায় তার দাবি যথার্থ নয়। তার *বাঙালীর জাতীয়তাবাদ*[২২] বইটি পড়লে এমন মনে হওয়াই স্বাভাবিক। এমন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হয়েছে সাম্প্রদায়িকতা, এ কথাও তিনি বলতে ভোলেন না। বাংলাভাগ-ভারতভাগ তার কাছে গ্রেট ট্রাজেডি। তিনি কি মনে মনে এই ট্রাজেডির সংশোধন চান? বাঙালির ভাষা-সংস্কৃতিভিত্তিক রাষ্ট্রের জন্য নস্টালজিয়া তার এই বইতে বারবার ছুঁয়ে যায়।

ইতিহাস তিনি জানেন, যে ঘটনাগুলো একের পর এক ঘটেছে, সেগুলো সম্পর্কেও তিনি পূর্ণরূপে অবগত। কিন্তু ইতিহাস তিনি লেখেন ধর্মনিরপেক্ষতা-সাম্প্রদায়িকতা এই বাইনারির ছকের মধ্যে। পূর্বনির্ধারিতভাবে এই বাইনারির ছকের মধ্যে থেকে ইতিহাস লেখার ফলে ইতিহাসে কী ঘটে, সেটা তিনি তুলে আনতে পারেন না। তিনি কিছু ঘটনা বাছাই করে তার ধারণা বা তত্ত্বের যথার্থতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন মাত্র। উপর্যুপরি ধর্মনিরপেক্ষতা-সাম্প্রদায়িকতার কলকাতাবাহিত সংজ্ঞাটি গ্রহণের ফলে তার ইতিহাস ব্যাখ্যাটা পক্ষপাতমুক্ত থাকতে পারে না। এ কারণেই ভারতবর্ষে মুসলমানদের নেতা জিন্নাহ বা তাদের পাকিস্তান আন্দোলনকে তিনি বরাবরই সাম্প্রদায়িকতার মালায় গেঁথে দিতে পছন্দ করেছেন।

বাঙালির জাতি রাষ্ট্র কেন প্রতিষ্ঠা হতে পারেনি বা ভারত কেন ভাগ হলো এটা তার অজানা নয়, কিন্তু এ পথের একটা প্রধান কাঁটা যে ছিল হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা—এ কথাটা তিনি জোর গলায় বলতে পারেন না। অথচ আজকের দিনের অনেক পরিশ্রমী গবেষক ভারত বা বাংলা বিভাগের মতো ইতিহাসের জটিল অধ্যায়গুলোর ওপর বিস্তর কাজ করেছেন এবং হিন্দু সম্প্রদায়িকতার স্বরূপকে উন্মোচন করেছেন। চৌধুরীর লেখালেখিতে এসবের কোনো ছাপ দেখা যায় না। এটা শুধু চৌধুরী নয়, এ দেশের মার্কসবাদীদেরই একটা বড়ো সীমাবদ্ধতা। কারণটা আগেই বলেছি—এ দেশে মার্কসবাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল বেঙ্গল রেনেসাঁর হিন্দুত্ববাদী প্রকল্পের অংশ হিসেবে।

এ কারণেই টাটা-বিড়লার প্রভাবাধীন কংগ্রেসের প্রতি এদের সহানুভূতি বেশি। এদেরকে তাদের কখনো বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীল মনে হয় না। কিন্তু ইস্পাহানী দাউদের প্রভাবাধীন মুসলিম লীগকে সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণি শত্রু হিসেবে গণ্য করতে এদের উৎসাহের অন্ত নেই। চৌধুরী সাম্প্রদায়িকতা বিষয়ে একটা ঢাউস সাইজের বই লিখেছেন, যার নাম *জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও জনগণের মুক্তি ১৯০৫-৪৭*।[১৩] এ বইয়ে ভারত বিভাগের রঙ্গমঞ্চে জিন্নাহর ভূমিকাকে তিনি কমবেশি ভিলেন হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। অথচ কংগ্রেস ও তার নেতাদের যে দায়িত্ব থাকতে পারে, সেটা তিনি আশ্চর্য কোমল পেলব ভাষায় কম করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। এটাকে চৌধুরীর সাহিত্যিক চাতুর্য বলা যায়, যা ইতিহাসের জন্য বড়ো একটা তামাশা হয়ে গেছে।

চৌধুরী তার লেখালেখিতে সব সময় Analytical tool হিসেবে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদকে ব্যবহার করেন। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী তিনি—এটা আমরা জানি। কিন্তু তিনি পশ্চিমা পুঁজিবাদের সমালোচনায় যতখানি মুখর, আমাদের দেশে ভারতীয় পুঁজির আগ্রাসন নিয়ে তার তেমন কোনো মাথাব্যথা নেই। মার্কসবাদী হয়েও বঙ্গীয় স্ট্যাব্লিশমেন্টের তিনি সমালোচনা করেন না। কারণ, এই স্ট্যাবলিসমেন্ট এ দেশে বেঙ্গল রেনেসাঁর প্রগতিশীলতাকে সযত্নে রক্ষা করে। বুদ্ধিজীবী হিসেবে এটা তার সীমাবদ্ধতা বৈকি।

চিন্তক হিসেবে ধর্মকে প্রগতি-প্রতিক্রিয়াশীলতার বাইনারি ছকের বাইরে তিনি বুঝতে চাননি। কিন্তু ইতিহাসে ধর্মেরও যে একটা প্রগতিশীল ভূমিকা আছে, এটা তিনি কখনো ভাববার চেষ্টা করেননি। নিজের পড়াশোনার সূত্রে খ্রিষ্টান ও হিন্দু ধর্ম নিয়ে তার জানাশোনা আছে বলে মনে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তিনি যে সমাজে জন্মগ্রহণ করেছেন, সেই মুসলিম সমাজ বা তার ইসলাম ধর্মকে নিয়ে তিনি কখনোই ভাববার ফুরসত পাননি। তিনি চিরকালই ইসলামকে মৌলবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীলতার আকারে পাঠ করতে চেয়েছেন। নিজের ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে অসূয়া তার ভেতরে একধরনের আলোড়ন ও বিক্ষোভ তৈরি করেছে। সেই আলোড়নের ফলে তিনি যে ইতিহাসের বিবেচনাবোধ তৈরি করেছেন, তা এ ভূখণ্ডে প্রচলিত প্রগতিশীলতার বয়ানের মধ্যেই আটকে আছে। কিন্তু এর মধ্যে বৈচিত্র্য নেই, উদ্ভাবনশীলতাও নেই। সবই তিনি এক ছকে বেঁধে ব্যাখ্যা করেন, যার পুরোটাই বিকৃত স্বাদ হয়ে গেছে। তিনি সময়কে প্রভাবিত করতে পারেননি, সময়ের স্রোতে ভেসে গেছেন।

০৬

ওপরের আলোচনায় আমাদের দেশের তিনজন প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীর চিন্তাভাবনাকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। আমাদের এখানকার সেকুলারিজমের গতি-প্রকৃতি বুঝতে এদের চিন্তার কাঠামোটা ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয়েছে, এদের চিন্তাভাবনা যতটা না ইউরোকেন্দ্রিক, তার চেয়ে বেশি কলকাতাকেন্দ্রিক।

ইউরোপে সেকুলারিজমের বিকাশের নানা পর্যায় আছে। এর নানা ওঠানামা ও বাঁকবদলের জায়গা আছে। সেখানে সেকুলারিজম যেমন ধর্মের সাথে মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয়েছে, তেমনি বিভিন্ন স্তরে সেকুলারিজমের সাথে ধর্মের বোঝাপড়া ও আপসের জায়গাও আছে। সেখানে সেকুলারিজম ও ধর্মের সম্পর্কটা কোথাও কোথাও বাইনারি হলেও সর্বত্র নয়। এরা কখনো কখনো এক মোহনায় এসে মিলিতও হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই সেকুলারিজম সেখানকার ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ধর্মকে বাদ দিয়ে অগ্রসর হয়নি। এর পাশাপাশি সেখানকার পণ্ডিতদের সেকুলারিজমের সাথে একধরনের সমালোচনামূলক বোঝাপড়াও আছে। এরা যেমন সেকুলারিজমের ইতিবাচক দিকগুলোর কথা বলেছেন, তেমনি কেউ কেউ এর নেতিবাচক দিকেও ইঙ্গিত করেছেন। ইউরোপে সেকুলারিজমের সাথে এই যে বিচিত্রভাবে বোঝাপড়া, এটা তাদেরকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেকুলারিজমকে সদর্থক অর্থে ব্যবহার করতে সাহায্য করেছে। কিন্তু আমাদের দেশের সেকুলার ভাবুকদের সেকুলারিজমের সাথে এই ধরনের কোনো ক্রিটিক্যাল এনগেইজমেন্ট নেই। এদের সেকুলারিজম বিষয়ক আলাপ এখনও প্রচলিত প্রগতিশীলতার বয়ানের মধ্যে আটকে আছে। সেকুলারিজমকে বুঝতে ইউরোপে এর বিকাশের বিভিন্ন পর্বগুলো বোঝা দরকার, কারণ এ চিন্তা ওখান থেকেই এসেছে। কিন্তু আমাদের এখানকার সেকুলার ভাবুকদের চিন্তার সীমানাটা কলকাতাকেন্দ্রিক রেনেসাঁর হাত ধরে গড়ে উঠেছে বলে তাদের সেকুলারিজম ব্যাখ্যাটা অত্যন্ত সংকীর্ণ। এরা সেকুলারিজম বলতে যা লেখেন বা বোঝেন, তা আসলে কতখানি সেকুলারিজম সেটাও একটা পর্যালোচনার বিষয়। এদের সেকুলারিজমের বৈশিষ্ট্যগুলোকে এভাবে শনাক্ত করা যায় :

১. এখানকার সেকুলারিজম বেঙ্গল রেনেসাঁর হিন্দুত্ববাদী প্রকল্পের অংশীদার হিসেবে চালু হয়েছে।

২. এটা পুরো দস্তুর ইসলামোফোবিক।

৩. এখানকার সেকুলারিজম বাংলাভাষীদের মেলায়নি, বিচ্ছিন্ন করেছে মাত্র। এটি কোনো জাতীয় ঐক্যের পূর্বশর্তও তৈরি করেনি।

৪. এখানকার সেকুলারিজম প্রগতিশীল নয়; উলটো বহুমাত্রায় সাম্প্রদায়িক। এটা এ দেশের মানুষকে ঠিকমতো প্রতিনিধিত্ব করে না।

সেকুলারিজম তো মানুষের কথা বলে। বাংলাদেশকে যদি একটা জাতিরাষ্ট্র হিসেবে দাঁড়াতেই হয়, তাহলে বর্তমানে প্রচলিত সেকুলারিজমের পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। এখানকার মানুষ, তার ধর্ম, সংস্কৃতি, ইতিহাস বাদ দিয়ে কোনো সেকুলারিজমের চর্চা স্রেফ পরগাছা সেকুলারিজমে পরিণত হবে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসের সেকুলারিজম তার বড়ো নজির।

রেফারেন্স

১. Talal Asad, *Formations of the Secular : Christianity, Islam, Modernity*. Stamford, California : Stamford University Press, 2003.

২. Ibid.

৩. Talal Asad, *Secular Translations : Nation State, Modern self and Calculative reason*. New york: Columbia University Press, 2018.

৪. Talal Asad, *Formations of the Secular*.

৫. Talal Asad, *Secular Traslations*.

৬. বদরুদ্দীন উমর, *সাম্প্রদায়িকতা*। ঢাকা : মওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৫

৭. বদরুদ্দীন উমর: *সংস্কৃতির সংকট*। ঢাকা : গ্রন্থনা, ১৯৬৭

৮. বদরুদ্দীন উমর, *সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা*। ঢাকা : গ্রন্থনা ১৯৬৯

৯. এবনে গোলাম সামাদ, *বাংলাদেশ : সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি প্রতিক্রিয়া*। ঢাকা : মজিদ পাবলিকেশন্স, ২০০৩

১০. আনিসুজ্জামান, *কাল নিরবধি*। ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৩

১১. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলাসাহিত্য*। ঢাকা : লেখক সংঘ প্রকাশনী, ১৯৬৪

১২. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *বাঙালীর জাতীয়তাবাদ*। ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১১

১৩. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও জনগণের মুক্তি ১৯০৫-৪৭*। ঢাকা : সংহতি, ২০১৫

মুসলিম সাহিত্য সমাজ :
পূর্ববঙ্গে ইসলামবিদ্বেষের সাংস্কৃতিক পটভূমি

০১

মুসলিম সাহিত্য সমাজ নিয়ে মূল আলোচনায় প্রবেশের আগে এর পটভূমিটা একটু আলোচনা করা দরকার। তাহলে এই সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও তৎপরতা বুঝতে আমাদের সুবিধা হবে।

মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা শহরে, ১৯২৬ সালে। এর মুখপত্রের নাম ছিল 'শিখা'। এ কারণে এদেরকে শিখাগোষ্ঠীও বলা হয়ে থাকে। এ প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কর্ণধার ছিলেন ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের বাংলার শিক্ষক কাজী আবদুল ওদুদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমার্সের শিক্ষক আবুল হুসেন। এদের কর্মতৎপরতার মূলকেন্দ্র ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হল। প্রধানত তরুণ মুসলিম ছাত্রদের অভিমুখ করেই এ প্রতিষ্ঠানটি তার কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করে।

মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাত্র পাঁচ বছর আগে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রধানত পিছিয়ে পড়া পূর্ববঙ্গীয় মুসলিম সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য এ বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতার ব্রাহ্মণরা এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তীব্র বিরোধিতা করেছিল। এদের বিরোধিতার মুখে মুসলিম নেতারা অনেক লড়াই করে এ বিশ্ববিদ্যালয় শেষমেশ প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন।

এর প্রতিষ্ঠাতা নওয়াব সলিমুল্লাহ ও নওয়াব আলী চৌধুরীর মতো লোক চেয়েছিলেন এটি মুসলিম শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটি কেন্দ্র হবে এবং বাঙালি মুসলমান তরুণরা আধুনিক শিক্ষা পেয়ে তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পশ্চাদ্‌গামিতা থেকে উত্তরণ ঘটাতে পারবে। তারা প্রকৃতপক্ষে চেয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হবে আলীগড়ের মতো একটি প্রতিষ্ঠান। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আলীগড় হতে পারেনি। এর কারণ আমরা এখন একটু খতিয়ে দেখব।

প্রথমদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্ররা ছিল সংখ্যালঘু। অন্তত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা অবধি। এর একটা প্রধান কারণ ছিল মুসলমান ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষা নেবার মতো যথেষ্ট অর্থনৈতিক সংগতি ছিল না। অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফ্যাকাল্টিতে যোগ দেওয়ার মতো বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম ছাড়া যথেষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন মুসলমান শিক্ষক পাওয়া যায়নি। এই শূন্যতার সুযোগ নেয় বাঙালি হিন্দুরা এবং যারা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছিল, তারা এসেই এটির ফ্যাকাল্টি ভরে ফেলে।

এভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বোধন কালেই এখানে হিন্দু আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর শিক্ষানৈতিক ও অবকাঠামোগত টুলসগুলো হিন্দুদের হাত দিয়েই তৈরি হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান বেনিফিশিয়ারি হয় হিন্দুরাই। এভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ঠেকাতে না পারলেও হিন্দুরা এটিকে সাংস্কৃতিকভাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডামি বানিয়ে ফেলে। ফলে এ প্রতিষ্ঠান থেকে যে মুসলমান ছেলেরা বেরিয়ে আসে তারা মুসলিম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোনো আবহাওয়া পায়নি। এর ফল হয়েছে সুদূরপ্রসারী ও বিপজ্জনক!

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে শিখাগোষ্ঠীর মতো একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের উত্থান খুবই প্রশ্নবোধক। সেই কালে মুসলমান সমাজকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য তার অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত সামর্থ্যকে বৃদ্ধি করাটা বড়ো একটা বিষয় ছিল। মুসলিম নেতারাও সেইভাবে চিন্তা করেছিলেন। এইসব জরুরি প্রশ্ন এড়িয়ে শিখাগোষ্ঠীর নেতারা বললেন— মুসলমান সমাজ অনগ্রসর, পশ্চাদ্‌গামী, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও ধর্মে মোহাবিষ্ট। এর কারণ ইসলাম ধর্মের মধ্যে নিহিত। তাই ইসলাম ধর্মের একধরনের সংস্কারের পক্ষে তারা মতামত হাজির করলেন। এমনকি তারা শরিয়তের কিছু অংশ বর্জনের পক্ষেও মত দেন। তাদের মতে, এটা করলেই মুসলিম

সমাজ শনৈ শনৈ প্রগতির পথে অগ্রসর হবে। শিখাগোষ্ঠীর এই রহস্যজনক তৎপরতা নিয়ে বাংলাদেশের একজন প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী লিখেছেন—

'ব্রিটিশ ভারতের দু শ বছর ইঙ্গ-ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দ্বারা বাঙালি মুসলমানদের ভাষা-সংস্কৃতি-সাহিত্য-ইতিহাস-ঐতিহ্যের ওপর যে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ ঘটে গিয়েছিল, সেই ধ্বংসযজ্ঞ থেকে আপন ভাষা সাহিত্য-সংস্কৃতি-ইতিহাস-ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের কাজই ছিল তৎকালীন বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের প্রধান কাজ। সে কাজটি কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও তিতুমীর, হাজী শরীয়তুল্লাহ ও সৈয়দ আমীর আলীর মতো বাঙালি মুসলিম মনীষীরা অনেক আগে থেকেই শুরু করেছিলেন। কিন্তু শিখাগোষ্ঠী সেই পথে পা না বাড়িয়ে বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলনে নামলেন কলকাতার অনুকরণে মুসলিম সমাজকে 'আধুনিক', 'প্রগতিশীল' ও 'ধর্মনিরপেক্ষ' বানানোর উদ্দেশ্যে।

বলাবাহুল্য, শিখাগোষ্ঠী যে ধারায় বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান, সেটি ছিল এ ভূখণ্ডের দুই শ বছরের সবচেয়ে নিপীড়িত, অবহেলিত, বঞ্চিত, সংখ্যাগরিষ্ঠ বিপুল মুসলিম জনগোষ্ঠীর চিন্তাচেতনায় নবজাগরণ ও শক্তিবৃদ্ধির কাজে পূর্ববর্তী তিতুমীর, হাজী শরীয়তুল্লাহ ও সৈয়দ আমীর আলীর চিন্তা ও আন্দোলনের বিপরীত ধারা। মূলত সেটি ছিল সে সময়কার ঔপনিবেশিক পাশ্চাত্য চিন্তা ও তার সঙ্গে সমন্বিত কলকাতাকেন্দ্রিক ব্রাহ্মণ্যবাদী চিন্তা ও শিক্ষা-সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত বুদ্ধিবৃত্তিক ধারা। এর ফলে বাঙালি মুসলমানদের দু শ বছরের আত্মবিস্মৃতির সংকট আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। বাঙালি মুসলমান সমাজ, এমনকি নিম্নবর্ণীয় সনাতন ধর্মীয় সমাজ একদিকে 'আধুনিকতার' নামে পাশ্চাত্যের অনুকরণে পুঁজিবাদী বিকৃত সংস্কৃতি, অন্যদিকে কথিত ধর্মনিরপেক্ষতার নামে বর্ণবাদী ও সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতির আগ্রাসনের মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত হয়।...'

সেই শিখাগোষ্ঠীর ঔরসেই আজ থেকে প্রায় এক শ বছর আগে এ দেশে জন্ম নেয় আধুনিক ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী শ্রেণি— তার ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালে প্রবল শক্তি নিয়ে উত্থান ঘটে কথিত 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী' এবং 'মৌলবাদ' বিরোধিতার নামে ইসলামবিদ্বেষী এক বিশাল পেটিবুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর। এমনকি উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদেরও উৎপত্তি সেখান থেকেই।[১]

শিখাগোষ্ঠীর কর্ণধাররা ও এর সাথে জড়িত কর্মীরা মোটের ওপর রাজনৈতিক চিন্তার দিক দিয়ে জাতীয়তাবাদী ছিলেন—জাতীয়তাবাদী মানে কংগ্রেসি জাতীয়তাবাদী। এরা মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যবাদী ভাবনাচিন্তাকে পছন্দ করতেন না। এমনকি সেকালের প্রেক্ষিতে অনগ্রসর মুসলমান সমাজকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য এরা তাদের বিশেষ কোনো সুবিধা দেওয়ার পক্ষপাতিও ছিলেন না। এ নিয়ে তারা রীতিমতো লেখালেখিও করেছিলেন। এসব প্রেক্ষিতে বিচার করলে শিখাগোষ্ঠীর সেদিনকার তৎপরতা কংগ্রেসের রাজনীতির অংশ হিসেবেই বিবেচনা করতে হবে। যদিও জোর গলায় দাবি করতেন—তারা মুসলমান সমাজের প্রকৃতই কল্যাণকামী, তারা যা করছেন মুসলমান সমাজের উন্নতির দিকেই চেয়ে করছেন।

শিক্ষানৈতিক ও অবকাঠামোগতভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাস করার পর কংগ্রেস শিখার মাধ্যমে নতুন চাল চেলেছিল মাত্র। যে মুষ্টিমেয় মুসলমান ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসত সাংস্কৃতিকভাবে তাদেরকে দিশাহারা করার জন্য মুসলিম সাহিত্য সমাজ কাজ শুরু করে। এর যে কিছুটা বিষফল ফলেনি, তা বলা যাবে না।

এ কারণেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশেষ করে পাকিস্তান হবার পরও এখান থেকে যে বিপুল গ্রাজুয়েট ও সাহিত্যিক শ্রেণি সেকুলার চিন্তা ও কলকাতার আরোপণমূলক সংজ্ঞায়িত বাঙালি জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বেরিয়ে এলো, তার বীজাঙ্কুর খুঁজতে হবে এ বিশ্ববিদ্যালয়টির উন্মেষকালের গলদ ও বিচ্যুতির মধ্যে। হিন্দু অ্যাকাডেমিশিয়ানদের দ্বারা এ প্রতিষ্ঠানটির কাঠামোগত অপরায়ন ও শিখাগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক রাজনীতি এই সেকুলারায়নে যে অনেক বড়ো ভূমিকা রেখেছে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

০২

মুসলিম সাহিত্য সমাজ আসলে কী চেয়েছিল? আজ এতদিন পর এই সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানটির মূল্যায়ন হওয়া দরকার এই কারণে যে, এটি তাদের দাবি অনুযায়ী আসলেই কি মুসলিম সমাজের জন্য কোনো হিতবাদী সম্ভাবনার সূচনা করেছিল? এদের মন্ত্র ছিল বুদ্ধির মুক্তি। এদের পত্রিকা শিখার আখ্যাপত্রে লেখা থাকত—'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।' বুদ্ধির মুক্তি বলতে এরা বুঝত স্বাধীনভাবে চিন্তা চর্চা করা। এই স্বাধীনতার সীমানা কতটুকু ছিল? এদের মতে ধর্মের নির্দেশের সঙ্গে বিচারবুদ্ধির বিরোধ যেখানে অনুভূত হবে সেখানে বিচারবুদ্ধির স্থান হবে ওপরে, ধর্মের স্থান হবে নিম্নগামী।

এসব চিন্তা তারা পেয়েছিলেন প্রধানত পশ্চিম থেকে, পশ্চিমের আলোকায়নের চিন্তাভাবনা থেকে। কারণ, এদের প্রধান মোহ ছিল পশ্চিম। আর সেই পশ্চিমের আলো চুয়ে উনিশ শতকের কলকাতায় যে হিন্দুদের জাগরণ ও জোয়ার এসেছিল, সেটি তাদেরকে দ্বিতীয় মোহপাশে জড়িয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসনে মুসলিম সমাজ ভেঙেচুরে বরবাদ হয়ে গিয়েছিল। তার সৃষ্টিশীলতা স্থবির হয়ে পড়েছিল। এরকম একটা সমাজে জন্মগ্রহণ করে এরা এক গভীর হতাশা ও হীনম্মন্যতায় মজেছিলেন। এর থেকে ত্রাণ পাওয়ার জন্য তাই তারা উনিশ শতকের হিন্দু জাগরণকে আদর্শ স্থানীয় হিসেবে গণ্য করে এর আদলে বাঙালি মুসলমান সমাজকে গড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাঙালি মুসলমান সমাজের গড়নটাই যে আলাদা, এর ধর্মীয়-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পটভূমি যে ভিন্নতর, সেখানে রামমোহন-রবীন্দ্রনাথের টোটকা এনে বসিয়ে দিলেই যেকোনো হিতকারী ফল ফলবে না, এই কাণ্ডজ্ঞানটুকু তাদের ছিল না।

মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠার পটভূমি বর্ণনা করতে গিয়ে এর একজন সক্রিয় কর্মী আবদুল কাদির লিখেছেন—

> '১৮২৭ সালে কলকাতায় হিন্দু কলেজের স্বনামখ্যাত শিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেখানে তার ছাত্ররা 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের তরুণ সিংহশাবকেরা (Young lions of Bengal) শাস্ত্রানুগত্য,

> ধর্মাবতার, অদৃষ্টবাদ, জাতিভেদ, পৌত্তলিকতা প্রভৃতি বিষয় মুক্তকণ্ঠে আলোচনা করতেন। তারই আদর্শে ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ শে জানুয়ারি (১৩৩২ সালের মাঘ মাসে) প্রধানত আমারই উদ্যোগে ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।'[২]

এ থেকেই বোঝা যায় মুসলিম সাহিত্য সমাজের আদর্শিক অনুপ্রেরণা ছিল ডিরোজিও ও তার ইয়ং বেঙ্গলের দল। ওদুদ ও আবুল হুসেনরা মুসলিম সমাজের ডিরোজিও হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আসল কথা হলো, মুসলিম সমাজের ওপর সেদিনের ইয়ং বেঙ্গলের কোনো প্রভাব ছিল না। এদের আদর্শের আদলে তৈরি মুসলিম সাহিত্য সমাজ নিয়ে তাই সাধারণ মুসলমান সমাজের ভেতরে প্রতিক্রিয়া হওয়াই স্বাভাবিক ছিল।

ইয়ং বেঙ্গল প্রথমদিকে কিছু হিন্দু সমাজের সংস্কারের কথা বললেও সংস্কারের নামে এটা একসময় একটি উচ্ছৃঙ্খল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। তাই হিন্দু সমাজ এটিকে শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করেনি। মুসলিম সমাজও সংগত কারণে শিখাগোষ্ঠীর বিশেষ করে ইসলাম ধর্ম বিষয়ে উন্নাসিক কথাবার্তা নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল।

মুসলিম সাহিত্য সমাজ রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের খুব অনুরাগী ছিল। বিশেষ করে কাজী আবদুল ওদুদ এদের কথা বারবার বলেছেন। কিন্তু এরা এদের প্রতি যতখানি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, এদের চিন্তাভাবনাকে তারা ঠিকমতো পর্যালোচনা করতে পারেননি। রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কারণে এদের চিন্তাভাবনা মুসলমান সমাজে তেমন প্রভাব ফেলেনি। নবজাগরণের প্রশ্নে এদের আদর্শের অনুবর্তী হতে মুসলমান সমাজ কুণ্ঠিত হয়েছে। সমাজ বাস্তবতার আলোকে মুসলিম সাহিত্য সমাজের কর্ণধাররা এ সবকিছুর বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখতে চাননি।

সংস্কার বললেই সেটা সংস্কার ও বিপ্লবী একটা প্রচেষ্টা হয়ে যাবে না, যতক্ষণ না তার সাথে সমাজের একটা আত্মিক যোগ থাকে। এই আত্মিক যোগবিহীন সংস্কার চেষ্টাটাই অনেকটা আরোপণমূলক পদ্ধতিতে এরা চালাতে চেয়েছিলেন। এদের মুখপাত্র শিখাতে সৃষ্টিধর্মী তেমন কোনো লেখা ছাপা হয়নি। এদের যাবতীয় লেখা ছিল মুসলিম সমাজকে ঘিরে এবং এদের সব ধরনের সৃষ্টিশীলতা ব্যয় হতো মুসলিম সমাজের গলদ চিহ্নিত করতে।

এদের কাছে মুসলমান সমাজের সমস্যা ছিল অনগ্রসরতা, পশ্চাদ্‌বর্তিতা, জ্ঞানচর্চার অভাব, ধর্মীয় গোঁড়ামি, অতীতের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ও সম্মোহন। কথা হলো, এ ধরনের সমস্যা কি মুসলমান সমাজ ছাড়া অন্য কোনো সমাজে হয় না। হিন্দু সমাজের বর্ণাশ্রম, জন্মান্তরবাদ, সতীদাহর মতো বিশ্রী প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করে এদের প্রিয় মানুষ রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথও কি খুব বেশি সফল হয়েছেন? এমনকি আজ অবধি?

মুসলমান সমাজ পিছিয়ে পড়েছিল সেদিনের ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ ও তার সুবিধাভোগী জমিদারদের শোষণের ফলে অর্থনৈতিক আত্মপ্রতিষ্ঠার অভাবে। অথচ বৈষম্যের শিকার হওয়া এই সমাজের প্রতি সামান্য সহানুভূতি না দেখিয়ে, সমস্যার কারণ চিহ্নিত না করে, এরা দিনের পর দিন উপসর্গ নিয়ে মাতামাতি করে গেছেন। সেদিন তারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে মুসলমান সমাজকে নিন্দা করে জমিদারদের তৈরি রেনেসাঁকে দায়মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া একটা সমাজের কাছে ললিত কলা বা চিত্রকলা চর্চার সমস্যা-ই এদের কাছে তখন বড়ো হয়ে দেখা দিলো। এসব কথা বলে তারা মুসলমান সমাজের মূল সমস্যাকে আড়াল করে তাদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া থেকে বঞ্চিত করতে চেয়েছিল। এটা ছিল সেদিনকার কংগ্রেসি রাজনীতির কৌশল। মুসলিম সাহিত্য সমাজের রথীরা যা চেয়েছিলেন, তার একটা ফিরিস্তি করতে পারি—

১. ইসলাম ধর্মকে যুগোপযোগী করা।
২. ধর্মের আনুষ্ঠানিক অংশ বাদ দেওয়া (তাদের মতে, এতে ধার্মিকতার সমস্যা হয় না)।
৩. শরিয়তের পরিবর্তন।
৪. ধর্মনেতাদের আদেশ অগ্রাহ্য।
৫. ইসলামের চেয়ে মানবধর্মই শ্রেষ্ঠ।
৬. গুণেমানে রাসূল (সা.)-কে অতিক্রম করার ঔদ্ধত্যপূর্ণ ঘোষণা।
৭. রাসূল (সা.)-এর নবুয়তকে অস্বীকার করে তাঁর মনুষ্যত্বকে উদ্‌যাপন করা—ইত্যাদি।

এরকম কর্মসূচি যেকোনো সমাজেই প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেবে, প্রতিক্রিয়ার জন্ম না হওয়াটাই অস্বাভাবিক। পশ্চিমের যুক্তিশীল ও আলোকিত সমাজেও

জেসাসের অলৌকিকতা অস্বীকার অথবা তাকে গুণেমানে ছাড়িয়ে যাওয়ার দাবি কিংবা খ্রিষ্টীয় সমাজের মোরাল কোড পরিবর্তনের দাবি কেউই সহজে গ্রহণ করবে না। একটি অস্বাভাবিক ক্রিয়ার অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াই হয়। অথচ মুসলমান সমাজে যখন এর প্রতিক্রিয়া দেখা গেল, তখন শিখাগোষ্ঠীর লোকজন বা এর অনুরাগীরা একে বললেন প্রতিক্রিয়াশীলতা ও ধর্মীয় গোঁড়ামি। কী আশ্চর্য আত্মপ্রবঞ্চনা।

শিখাগোষ্ঠীর রথীরা সেদিন উদ্দেশ্যমূলকভাবেই মুসলমান সমাজকে ছোটো করেছিলেন এবং ইসলামকে নেতিবাচকভাবে হাজির করে এ দেশে ইসলামবিদ্বেষের প্রথম বীজটি রোপণ করেছিলেন।

০৬

শিখাগোষ্ঠীর পয়লা মেন্টর ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ। তিনি বরাবরই অখণ্ড ভারতীয় আদর্শে বিশ্বাস করতেন। ভারত বিভাগকে সমর্থন করেননি। এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাও তার কাছে অনভিপ্রেত ছিল। রাষ্ট্রচিন্তায় তিনি মহাত্মা গান্ধীর আদর্শের অনুসারী ছিলেন এবং গান্ধী আদর্শের তিনটি মূলনীতির প্রতি তার আনুগত্য চিরকাল অটুট ছিল: সত্যাগ্রহ, অহিংসা এবং চরকা।[৩]

এই বিশ্বাসে তিনি এতখানি সবল ছিলেন যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তার পৈত্রিক বাড়ী ফরিদপুর হওয়া সত্ত্বেও তিনি পাকিস্তানে না এসে ভারতে থেকে গিয়েছিলেন। এদিক দিয়ে অনেক সুবিধাবাদী মুসলমানের মতো পাকিস্তানের আদর্শে বিশ্বাসী না হয়েও এখানে এসে অনেক কিছু গুছিয়ে নেওয়ার মানসিকতা তার ছিল না। এক্ষেত্রে তিনি আবু মোহাম্মদ হবীবুল্লাহ, শওকত ওসমান, আনিসুজ্জামান, হাবিবুর রহমান, হাসান আজিজুল হক প্রমুখের তুলনায় অনেক বেশি সৎ ও প্রগতিশীল ছিলেন বলে ধরে নেওয়াই যায়।

কাজী আবদুল ওদুদের যে প্রবন্ধটি সবচেয়ে বেশি আলোচিত-সমালোচিত হয়েছিল, তার নাম 'সম্মোহিত মুসলমান'। এ প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি লিখেছেন—'ইসলামের ইতিহাস বহু পরিমাণে এক ব্যর্থতার ইতিহাস।' এরকম কথা বোধ হয় ইসলামের বড়ো শত্রুরা কিংবা অসূয়াপ্রবণ ওরিয়েন্টালিস্টরাও খুব বেশি লিখতে পারেননি।

সভ্যতার ইতিহাসে উত্থান-পতন থাকে, থাকে সফলতা-ব্যর্থতাও। ইসলামেরও আছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, ইসলাম সভ্যতাকে কিছুই দেয়নি। এরকম অনৈতিহাসিক বাজে কথা ওদুদের মতো ভাবুকের কাছে প্রত্যাশিত নয়। এ ভুল স্বেচ্ছাপ্রণোদিত না অনিচ্ছাকৃত সেটা বলতে পারি না, তবে এসব কথা বলে মুসলিম সমাজের হিতৈষী দাবি করা একটু কঠিন কাজ বৈকি।

ওদুদ শরিয়তের বিরোধিতা করেছেন এবং এটির প্রত্যাবর্তনকে নাকচ করেছেন। অন্যদিকে রাসূলের প্রতি মুসলমান সমাজের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসাকে তিনি পৌত্তলিকতার সাথে তুলনা করেছেন। রাসূলের নবুয়তকে খাটো করে মনুষ্যত্বকে বড়ো করে দেখিয়েছেন। 'সম্মোহিত মুসলমান' প্রবন্ধ ছাড়াও 'মুস্তফা কামাল সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ও বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য সমস্যা' প্রবন্ধে তিনি একই রকম আওয়াজ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তার সবচেয়ে

বিখ্যাত কিতাব *শাশ্বত বঙ্গ*-এ পাতার পর পাতাজুড়ে তিনি এসব কথার পুনরাবৃত্তি করে গেছেন।

যুক্তিবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এসব ধর্মীয় সংস্কারের কথা বিভিন্ন ধর্মেও শোনা যায়। কিন্তু কথা হচ্ছে, ধর্মের তো একটা নিজস্ব মোরাল কোড থাকে, ওয়ার্ল্ড অর্ডার থাকে, রিভিলড প্রিন্সিপল থাকে—এগুলো বাদ দিলে ধর্ম থাকে না। যুগ যুগ ধরে ধর্ম যে টিকে থাকে এবং মানুষের অগ্রগতির সাথে চলমান থাকে, এর কারণ হচ্ছে ধর্মেরও একটা নিজস্ব অন্তর্গত ডায়নামিজম থাকে। এই ডায়নামিজমের জোরে ধর্ম যুগোপযোগিতাকে আত্মস্থ করে এবং সদাসক্রিয় বিশ্বপ্রক্রিয়ার সাথে অংশগ্রহণ করে। ধর্মের এই ডায়নামিজম ওদুদ বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই তিনি বারবার মুসলমান সমাজের অচলায়তন, পরিবর্তনহীনতা ও পরিবর্তনবিমুখতার জন্য আফসোস করেছেন। সেকালের বাঙালি মুসলমানের অচলায়তন ও অস্বস্তির প্রধান কারণ ছিল বৈরী রাজনৈতিক-সামাজিক দুর্যোগ, যার কথা ওদুদের লেখায় দেখতে পাওয়া যায় না। মুসলিম সমাজের পিছিয়ে পড়ার সামাজিক কার্যকারণ উদ্ধার না করে তিনি খামোখা এর জন্য ইসলামকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন।

যেকালে ওদুদ এসব কথা লিখেছেন, সে সময়েও মুসলমান সমাজে নব নব সংস্কার প্রচেষ্টা চলছে। একদিকে মুফতি আবদুহ, রশিদ রিদা, অন্যদিকে ইকবালের মতো যুগন্ধর ব্যক্তিরা মুসলিম সমাজকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য নতুন নতুন নীতি ও প্রস্তাব পেশ করেছেন। এগুলো কি ওদুদের চোখে পড়েনি?

মুসলমান সমাজের রাসূলের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতাকে ওদুদ রীতিমতো পৌত্তলিকতার সাথে তুলনা করেছেন। এটা ওদুদের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় বৈকি। ইসলামের মতো তৌহিদবাদী বা একেশ্বরবাদী ধর্ম আর একটিও পৃথিবীতে নেই। তৌহিদ হচ্ছে এই ধর্মের সারাৎসার। এই ধর্মের অনুসারীরা তাদের নবিকে ভালোবাসে—এটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তাদের নবিকে পূজা করে এরকম নজির ইতিহাসে নেই। আবার নবুয়ত ছাড়া রাসূলের প্রকৃত মর্যাদা কোথায়? এ যেন শাস ছাড়া ফলের খোসা নিয়ে টানাটানি। কোনো মুসলমান যদি ঘুণাক্ষরেও এরকম চিন্তা লালন করে, ইসলামে তার স্থান হবার সম্ভাবনা কম। এসব অনভিপ্রেত কথাবার্তা বলে ওদুদ ইসলাম ধর্মকেও কলুষিত করতে চেয়েছেন।

ওদুদ ধর্মের এক নতুন সংজ্ঞা দিতে চেয়েছিলেন। তিনি ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা বাদ দিয়ে ধার্মিকতার ওপর জোর দিয়েছেন। আনুষ্ঠানিকতাকে তিনি ধর্মের চিহ্ন মানতে রাজি হননি। এও এক ওদুদের অদ্ভুত আবিষ্কার। এ যেন মেঘ ছাড়া বৃষ্টির প্রত্যাশা।

চার্চের সার্ভিস ছাড়া কি খ্রিষ্টধর্ম থাকবে? দুর্গাপূজা, সরস্বতী পূজা, দিওয়ালী ছাড়া কি হিন্দু ধর্ম সম্ভব? ওদুদরা বারবার যুক্তিশীলতা, কাণ্ডজ্ঞানের কথা বলেছেন। কিন্তু ওদুদের এসব কথাবার্তায় যুক্তির ভার নেই বললেই চলে।

বাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ে ওদুদ ও তার সতীর্থদের উৎকণ্ঠার অন্ত ছিল না। ওদুদ লিখেছিলেন—ইসলাম নারীর অবরোধ সমর্থন করে, সুদ নিষিদ্ধ করে, ললিত কলায় আপত্তি জানায়। সেই কালে মওলানা আকরাম খাঁ *মোহাম্মদী* পত্রিকায় যুক্তি ও ঐতিহাসিক বরাত দিয়ে লিখেছিলেন চিত্রকলা, সঙ্গীত ও ক্ষেত্রবিশেষে সুদ ইসলামে নিষিদ্ধ নয় এবং নারীদের অবরোধ ব্যবস্থা ইসলামের বিধান নয়। আসল কথা হচ্ছে, ইসলামের খুব গভীরে না গিয়ে একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ওদুদরা এরকম আত্মঘাতী কাজে নেমে পড়েছিলেন। এ কারণে মওলানা আকরাম খাঁর মতো আলেম ওদুদের *নব পর্যায়* প্রবন্ধের বই প্রকাশ হলে তিনি সমালোচনা করে লিখেছিলেন এটি হচ্ছে 'নব বিপর্যয়'।[৪]

ওদুদ *বাংলার জাগরণ* বলে যে বইটা লিখেছিলেন, সেখানে ৯০ শতাংশই উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু জাগরণের কথা আলোচিত হয়েছে। তার এই *বাংলার জাগরণের* পর্যালোচনা শেষ পর্যন্ত রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিম, কেশব সেন ও রামকৃষ্ণ পরমহংসের আলোচনায় পর্যবসিত হয়। সেখানে বাংলার বড়ো শরিক মুসলমানরা থাকে অনুপস্থিত। যেটুকু আসে সেটা আলোচনার অনুষঙ্গ হয়ে, প্রধান বিষয়বস্তু হিসেবে নয়। তবে এ বইতে তিনি বাঙালি মুসলিম সমাজে ওহাবী প্রভাব ও কোনো মনীষার আবির্ভাব না হওয়ার কারণে তাদের অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির বিকাশ হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন। বিশেষ করে ওহাবী আন্দোলনকে তিনি পশ্চাদ্‌গামী আন্দোলন হিসেবে দেখেছেন। তার এ ভাবনা যথেষ্ট আধুনিক নয় বলেই মনে হয়। ওহাবী আন্দোলনের মতো এত বড়ো আন্দোলন, যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও তার দেশীয় অনুচর জমিদারদের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল, তার মধ্যে ওদুদ কোনো প্রগতিশীলতার উপাদান খুঁজে পাননি—এটা আশ্চর্যজনক বৈকি।

আসলে জমিদারদের তৈরি রেনেসাঁর আলো তাকে এতখানি সম্মোহিত করে ফেলেছিল যে, তার বাইরে আর কোনো প্রগতির লক্ষণ তার মতো দৃষ্টিগোচর হয়নি। অথচ তার মতো এই ফরিদপুরের আরেক মেধাবী সন্তান, জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদ ও চিন্তক হুমায়ুন কবির বাঙলার *জাগরণ* গ্রন্থের সীমাবদ্ধতা ঠিকই চিহ্নিত করতে ভুল করেননি। তার ভাষ্য উদ্ধার করছি—

> 'মনে হয় বাংলাদেশের মুসলমানের চিন্তাধারার সঙ্গে কাজী সাহেবের পরিচয় অপেক্ষাকৃত কম। এ কথা সত্য যে, পুরো উনিশ ও বিংশ শতকের অনেক দিন পর্যন্ত বাঙালি মুসলমান চিন্তা ও কর্মজগতে বড়ো রকমের কোনো দান করতে পারেনি, কিন্তু তাই বলে বাঙালি মুসলমান যে একেবারেই ভাবতে চেষ্টা করেনি, সে কথাও সত্য নয়। তিতুমীরের উল্লেখ বইখানিতে রয়েছে, কিন্তু পূর্ববঙ্গ বিশেষ করে ফরিদপুরে ফরাজী আন্দোলনের নামোল্লেখ কাজী সাহেব করেননি। ওহাবী আন্দোলনের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকলেও ফরাজী আন্দোলনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করা যায় না।
>
> হাজী শরীয়ত উল্লাহ এবং দুদুমিয়ার বাঙলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্থান রয়েছে এবং এই ঐতিহ্যকে বহন করেই অসহযোগ আন্দোলনের যুগে বাদশা মিয়া বাংলার মুসলমান সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে টানতে পেরেছিলেন। বাঙালি মুসলমান কেন ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে বহুদিন পর্যন্ত অসহযোগ করেছে, তার বিবরণ হান্টার সাহেবের আলোচনা থেকে জানা যায়। যখন অবশেষে সুবুদ্ধির উদয় হলো, নবাব আবদুল লতিফ, আমীর আলী, আবদুর রহিম প্রমুখ মনীষী নতুন চিন্তাধারার প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন। কাজী সাহেব সংক্ষেপে তার আলোচনা করেছেন কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, বাঙলার হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই স্বার্থের খাতিরে তার বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন। বিশেষ করে আমীর আলী যেভাবে ইসলামকে বুদ্ধির আলোকে প্রতিভাত করতে চেষ্টা করেছেন, বাংলার হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই সে কথা জানা উচিত।[৫]

রেনেসাঁর আলো ওদুদকে শুধু সম্মোহিত করেনি, নিজের সমাজ সম্পর্কেও হীনম্মন্যতার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। মুসলমান সমাজের কোনো ইতিবাচক দিকই তার চোখে পড়েনি। ওদুদ সাম্প্রদায়িকতাকে সমর্থন করেননি—এটা আমরা জানি। কিন্তু তার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কিত চিন্তার মধ্যে প্রভূত ত্রুটি

ও বিচ্যুতি ছিল। সেটাকে ঠিক জাতীয়তাবাদী বা অসাম্প্রদায়িক ভাবনা বলা যায় কি না তা প্রশ্নসাপেক্ষ।

ওদুদের বরাতে আবদুল কাদির লিখেছেন—

> '১৩৩৭ বৈশাখের 'জয়তীতে' আমার সম্পাদকীয় নিবন্ধ 'স্বাদেশিকতা ও মুসলমান' এবং 'স্বাধীনতা আন্দোলন' পড়ে কাজী আবদুল ওদুদ একখানি পত্রযোগে আমাকে লেখেন—হিন্দু যদি হিন্দু-ভারতও গড়তে চায়, তবু তাকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বলা যেতে পারে, যে পর্যন্ত দেশের প্রধান জনশক্তি হিন্দু।...
>
> তুমি বলতে পারো, হিন্দুরা মুসলমানদের কথা না ভেবে কিছু কম বুদ্ধির বা দুর্বল কল্পনার পরিচয় দিয়েছে, কিন্তু তাদের এ কাজ আদৌ অদ্ভুত বা অস্বাভাবিক নয়।'[৬]

এখানে তিনি জাতীয়তাবাদের নামে সাম্প্রদায়িকতাকেই প্রচার করেছেন। কংগ্রেস এই জাতীয়তাবাদের কথা বলত বলেই ভারত বিভাগ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। ওদুদ হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের কথা হয়তো ভেবেছেন, কিন্তু এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বাস্তবতার আলোকে বিশ্লেষণ করতে সমর্থ হননি।

শিখাগোষ্ঠীকে এর বিরোধীরা যে কিছুটা হিন্দুঘেঁষা বলত, এর কিছু বাস্তব কারণ তো ছিলই। এই হিন্দুঘেঁষা হওয়ার কারণে এরা মুসলমান সমাজের সমস্যাকে ঠিকমতো ধরতে পারেননি। আমরা নিম্নের উদ্ধৃতিটি দেখি। ওদুদের বরাতে আবদুল কাদির লিখেছেন—

> 'হিন্দু-মুসলমান বিরোধের জন্য মোটের ওপর কোন পক্ষ বেশি দায়ী, এ কথার সোজাসুজি উত্তর দিতে হলে বলতে হয়, মুসলমান। হিন্দু উত্তম নয় বরং অধম, তার দুর্বলতার অবধি নাই, তবু হিন্দু আলোর পথে জীবনের পথে পা বাড়াতে চেয়েছে; কিন্তু মুসলমান?'[৭]

মুসলমান আলোর পথে পা বাড়াতে চায়নি—এরকম কথা ওদুদ কোথা থেকে পেলেন? সব আলো কি তবে হিন্দুর গৃহে জমা হয়েছিল? আলো বলতেই-বা তিনি কী বোঝালেন? রেনেসাঁর আলো, ঔপনিবেশিকতার আলো? এ যদি কোনো হিন্দুসমাজের মুখপত্রের কথা হতো, তবে সেটা মানাত অনেক বেশি। বাস্তবে ওদুদ ছিলেন রামমোহন-রবীন্দ্রনাথের ছাঁচে গড়া এক বাঙালি, যে বাঙালির সাথে বাঙালি মুসলমানের সম্পর্ক ছিল যোজন যোজন দূরে। মুসলমান আলোর পথে হাঁটতে চায়নি, না জমিদাররা তাদেরকে আলোর

পথে হাঁটতে বাধা সৃষ্টি করেছিল—সেই বিচার ওদুদের পক্ষে করা সম্ভব হয়নি। মুসলমানরা ইংরেজি শিখতে চায়নি, আধুনিকতা চায়নি, জমিদারদের এসব প্রচারণার কথা আমরা জানি। ওদুদের কথার সাথে জমিদারদের কথার মিল দেখা যায়। এত বড়ো পণ্ডিত হয়েও নিজ সমাজকে এত ছোটো করে দেখেছেন, তা ভাবতে মনটা অপ্রসন্ন হয়ে যায়।

ওদুদের ভাব জীবনের আত্মীয়তা ছিল অখণ্ড ভারতবর্ষের সঙ্গে। সেই ভারতেই তিনি থেকে যান। তিনি ভেবেছিলেন, এটা একটা সেকুলার স্টেট হবে। এটা হবে মুক্তবুদ্ধির স্বর্গরাজ্য। বাস্তবে সেটা হয়নি। ওদুদের ভারতে সাম্প্রদায়িকতার চর্চা এখন কোন অংশে কম নয়। তার স্বপ্নের ভারত তাকে বিনিময়ে কি দিয়েছে? এত বড়ো রবীন্দ্রবিদ হওয়া সত্ত্বেও কলকাতার সাহিত্যাঙ্গনে সেই ওদুদের পরিণতিটা কেমন হয়েছিল, তা তার বন্ধু অন্নদাশঙ্করের লেখা থেকে তুলে ধরছি—

> 'ইচ্ছা করলেই তিনি পাকিস্তানে গিয়ে আরও উন্নতি করতে পারতেন এবং সাহিত্যের জন্য রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পেতে পারতেন। ভারতে তাঁকে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার বা রবীন্দ্র পুরস্কার দেওয়া হয়নি। এক হাজার টাকার শিশিরকুমার পুরস্কার দেওয়া হয় অন্তিমকালে। তার খানিকটা তিনি খয়রাত করেন, বাকীটা তাঁর মৃতদেহ সৎকারের কাজে লাগে। তিনি যে এতদূর নিঃস্ব এটা আমরা একদিন আগেও জানতুম না।'[৮]

কেন ওদুদ সেখানে অবহেলিত? তার রচনাবলি সেখানে পাওয়া যায় না। তাকে স্মরণও করা হয় না। তার রচনাবলি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশের বাংলা একাডেমি। অথচ তার লেখা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের গুণগানে ভরা। তার *শাশ্বত বঙ্গে* তো হিন্দুদেরই জয়জয়কার, মুসলমানের জন্য শুধু হাহাকার। তাহলে কেন এই পরিণতি? তিনি মুসলমান ছিলেন বলে? একই পরিণতি হয়েছে রবীন্দ্রভক্ত সৈয়দ মুজতবা আলী, হুমায়ুন কবির, এস ওয়াজেদ আলীদের। নিজের সমাজকে উপেক্ষা করার ট্রাজেডি এরা হাতে হাতে পেয়েছেন।

০৪

কাজী আবদুল ওদুদ ও আবুল হুসেনের চিন্তার গতি ও লেখালেখির অভিমুখ ছিল প্রায় একই রকম। দুজনের চিন্তা যেন এ ওর গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একজনকে বুঝতে হলে তাই আরেকজনের প্রসঙ্গ এমনিতেই চলে আসে। কারণ, এরা ছিলেন সতীর্থ। তবে ওদুদের লেখায় সাহিত্যমগ্নতা বেশি। হয়তো এ কারণেই তার লেখায় একধরনের রুচিবোধের মাত্রা আছে, কিন্তু হুসেনের ক্ষেত্রে সেটা অনুপস্থিত। এ কারণেই তার লেখা অনেক ক্ষেত্রে ঝাঁঝালো। বিশেষ করে ইসলাম ও মুসলমান সমাজকে নিয়ে লেখার সময় তিনি রুচির সীমা রাখতে পারেননি।

রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার দিক দিয়ে ওদুদের মতো হুসেনও ছিলেন জাতীয়তাবাদী-হিন্দু মুসলমানের সমন্বয়ের রাজনীতিতে বিশ্বাসী। সেদিক দিয়ে বলা যায় হুসেন ছিলেন কংগ্রেসের সমন্বয়ী রাজনীতির সমর্থক এবং মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনীতির ঘোরবিরোধী। তিনি স্বতন্ত্র নির্বাচনেরও বিরোধী ছিলেন এবং কংগ্রেসের মতো যৌথ নির্বাচনকে মুসলমানদের জন্য বেশি উপকারী মনে করতেন। এ সমস্ত দিক বিবেচনা করে সেদিনের প্রেক্ষিতে ওদুদ ও হুসেনের প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সাহিত্য সমাজকে কংগ্রেসের একটি সংস্কৃতিক অঙ্গসংগঠনও বলা যায়।

হুসেনের একটি বিতর্কিত প্রবন্ধের নাম হলো 'শতকরা পঁয়তাল্লিশ'। সেই কালে অবিভক্ত বঙ্গদেশে মুসলমান প্রার্থীদের জন্য শতকরা পঁয়তাল্লিশটি চাকরি সংরক্ষিত করার যে নিয়ম করা হয়েছিল, হুসেন এ প্রবন্ধে তার প্রতিবাদ করেছেন। শতকরা পঁয়তাল্লিশ ছিল সেকালের রাজনীতির একটা বিশেষ ব্যবস্থার ফল।

যেকোনো সমাজে পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়কে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সময় সময় কিছু অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া হয়। পৃথিবীতে এটা ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়। ইংরেজরা ভারত দখলের পর নানা ঐতিহাসিক কারণে মুসলমানরা পিছিয়ে পড়ে, হিন্দুরা এগিয়ে যায়। সেই ঐতিহাসিক বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে মুসলিম নেতারা স্বসমাজকে টেনে তুলবার জন্য সেকালের রাজনীতির কাঠামোর মধ্যে থেকেই ইংরেজদের কাছ থেকে মুসলমানদের জন্য এসব সুবিধা আদায় করেন। স্বতন্ত্র নির্বাচন, চাকরিতে কোটা পদ্ধতি ইত্যাদি। এতে দোষের কি আছে? হুসেন হিন্দুদের সাথে প্রতিযোগিতার কথা বলেছেন। তার ভাষা উদ্ধার করছি—

'শতকরা পঁয়তাল্লিশের মোহে আমাদের নবীন সম্প্রদায়ের আকাঙ্ক্ষা ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর হবে। কর্মস্রোতে ভাটা পড়বে। মন সংকীর্ণ হবে, মস্তিষ্ক শ্রমবিমুখ হবে। সমাজের মধ্যে বিভিন্ন দিক হতে জীবনের স্রোত আনবার সকল চেষ্টা ক্রমে রুদ্ধ ও শিথিল হয়ে যাবে।'[৯]

এসব কথার মধ্যে আদর্শবাদিতার একটা রং থাকলেও বাস্তববাদিতার কোনো চিহ্ন নেই। প্রতিযোগিতা হয় সমানে সমানে। বাঙালি মুসলমান সেই কালে সংখ্যাগুরু হলেও প্রতিযোগিতার অবস্থায় তারা ছিল না তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সামর্থ্যহীনতার দরুন। এ কথাটা মুসলমান নেতারা ঠিকই ধরেছিলেন। কিন্তু হুসেন মুসলমানদের হিতৈষী দাবি করলেও তার অবস্থান ছিল মুসলমান স্বার্থের বিরুদ্ধে।

হুমায়ুন কবিরের মতো দু-একজন ছাত্র নিজস্ব প্রতিভা বলে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উঁচু স্থান অধিকার করলেও ওই সময় সেটা মুসলমান সমাজে খুব বিরল ঘটনা ছিল। শিক্ষার ক্ষেত্রে সেকালে হিন্দু-মুসলমানদের বৈষম্য শুধু যোগ্যতা-অযোগ্যতার মাপকাঠিতে হয়নি, হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের কারণেও বৃদ্ধি পেয়েছিল।

আসল কথা হলো, শতকরা পঁয়তাল্লিশের জেরে এতদিন যারা ইংরেজের দুধ-মাখন পুরোপুরি খেয়ে আসছিল, তাদের পাতে ভাগ বসেছিল। কংগ্রেসও এতে খুব চটেছিল। হুসেন তার আদর্শবাদিতার আড়ালে কংগ্রেসের রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের পক্ষে নেমেছিলেন।

অন্যদিকে হুসেনের ধর্মচিন্তা, ধর্মসংস্কারের চিন্তা, ইসলাম সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাবের মধ্যে যথেষ্ট সহনশীলতা ছিল না। তিনি বহুক্ষেত্রেই ইসলাম ও মুসলমান সমাজকে কাঠগড়ায় আসামির মতো দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, যার কোনো নির্ভরযোগ্য ভিত্তি নেই। শাস্ত্রবিদ না হয়েও তিনি শাস্ত্রাধিকারের জায়গা নিতে চেয়েছেন এবং ইসলাম ও মুসলমান সমাজকে বিদ্রুপের বিষয় বানিয়েছেন। শাস্ত্রবিদ না হয়েও তিনি ইসলাম ধর্মের সংশোধনের পক্ষে বেপরোয়া মতামত প্রকাশ করেছেন।

যুগের আলোকে ইসলামের মধ্যে বহু সংস্কার হয়েছে এবং মুসলিম সমাজে যুগে যুগে এরকম বহু যোগ্য সংস্কারক আবির্ভূত হয়েছেন। তারা ইসলামের

চলমানতাকে এগিয়ে নিয়েছেন। ইতিহাসের যাত্রায় ইসলাম কখনো পিছিয়ে থাকেনি। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, হুসেন এসব প্রেক্ষাপট বিবেচনা না করে ইউরোপের রেনেসাঁ ও উনিশ শতকের হিন্দু জাগরণের ভাবধারাকে আত্মস্থ করে যে ইসলাম সংস্কারের প্রয়াসী হয়েছিলেন, মুসলমান সমাজ যদি তাতে অনাগ্রহী হয় তাহলে কি তাদের দোষ দেওয়া যায়। ইসলামকে পশ্চিমা আধুনিকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার সাথে সম্পর্কিত করার চেষ্টা তাই স্বাভাবিকভাবেই উলটো ফল দিয়েছে। হুসেনদের কথা ছিল—মানুষের যথার্থ কল্যাণ হয় জ্ঞানে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ধর্ম যে জ্ঞানের একটা উৎস, এই জ্ঞান তাদের হয়নি। হুসেনের কয়েকটি লেখার চুম্বক উদ্ধৃতি দিই, এতে তার ধর্ম ও ইসলাম সম্পর্কে ন্যক্কার কত প্রকট তা বোঝা যাবে—

(ক)

'যদি দেখা যায় ইসলামের কোনো বিধি মানবসমাজের কোনো উন্নতির পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে তবে নির্ভীকভাবে তাহা ত্যাগ করিয়া তদস্থলে নতুন বিধি গড়িতে হইবে, পুরাতনের মোহে হাবুডুবু খাইলে আর কল্যাণ নাই।' (মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ কৃত বুদ্ধির মুক্তিও রেনেসাঁ আন্দোলন)

(খ)

'সাধনার দ্বারা তুমি মুহম্মদের মতো কেন, তাঁর চেয়েও বড়ো হতে পার। কারণ, খোদা আলীউল আযীম। তা ভুলো না। মুহম্মদ মানুষের বিপুল বিকাশের একটা চমৎকার আদর্শমাত্র। তিনি যে একান্ত করে বড়ো হয়েছেন এবং তার মতো কেউ হতে পারে না, এ কথা স্বীকার করলে তোমার আত্মা চিরকালই ছোটো হয়ে থাকবে।' (সত্য, আবদুল কাদির সম্পাদিত আবুল হুসেন রচনাবলী)

(গ)

'সপ্তম শতাব্দীর আরব মরুর ইসলাম বিংশ শতাব্দীর শস্য-শ্যামল উর্বর দেশে কতখানি কার্যকরী হতে পারে।' (আদেশের নিগ্রহ)

(ঘ)

'মুসলমান জগৎ বুদ্ধির ঘরে তালা লাগিয়ে কেবল শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে মুসলমানের চলার পথে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে।' (মুসলিম কালচার ও উহার দার্শনিক ভিত্তি।)

(ঙ)

'ইসলামে যেসব ধর্মীয় আচার রয়েছে তা পালন করে মুসলমানরা যদি সৎ, সুন্দর, নীতিবান ও মহৎ হতে না পারে তবে ঐসব আচার পালনের প্রয়োজন ও সার্থকতা কোথায়?' (নিষেধের বিড়ম্বনা)

এসব মতামতের অনেক কিছুই সেদিন মুসলমানের ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত করেছিল। বিশেষ করে রাসূল (সা.)-কে অতিক্রম করার কালাপাহাড়ী দাবি কোনো মুসলমানের পক্ষে সহজে গ্রহণ করা সম্ভব কি? বুদ্ধির মুক্তির নামে স্বসমাজের অনুভূতিকে আঘাত করে আর যাই হোক সংস্কারের গুরুদায়িত্ব কাঁধে নেওয়া যায় না।

হুসেনের একটা বিতর্কিত প্রবন্ধের নাম হচ্ছে 'নিষেধের বিড়ম্বনা'। এখানে তিনি ইসলামকে আখ্যায়িত করেছেন নিষেধের সমষ্টি হিসেবে। হুসেনের মতে এই নিষেধগুলো এখন অকার্যকর হয়ে পড়ায় মুসলমান সমাজ একটা অপরাধী সমাজে পরিণত হয়েছে। এই অপরাধের তিনি যে ফিরিস্তি দিয়েছেন, তার বহুকিছু তথ্য সমর্থিত নয়। এবং সেগুলো সুস্থ মস্তিষ্কে পাঠ করা ধার্মিক মুসলমান তো দূরের কথা, সাধারণ মুসলমানের জন্যও পীড়াদায়ক। আসলে হুসেনরা ইসলাম নিয়ে যে হীনম্মন্যতার চূড়ান্ত স্তরে পৌছে গিয়েছিলেন, তারই বিস্ফোরণ ঘটেছে এই প্রবন্ধে। এর থেকে 'পতিত' মুসলমানের উত্তরণের উপায় কী? হুসেন পথ দেখাচ্ছেন মাদরাসা শিক্ষা বাদ দিতে হবে, ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং ইউরোপের আধুনিক জ্ঞানের ভান্ডারে নিমজ্জিত হতে হবে। শুধু তাই নয়, বাঙালি মুসলমানকে মোল্লাতন্ত্রের হাত থেকে রক্ষা করে ইউরোপের আলোয় আলোকিত করতে হবে।

ভালো কথা, কিন্তু মুসলমান সমাজে ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা তার অনেক আগেই আলোচনার বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে। সৈয়দ আহমদ খান, নওয়াব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী, কেরামত আলী জৌনপুরী, সৈয়দ আমীর হোসেন এসব নিয়ে প্রভূত কাজ করেছেন।

এর ফলে মুসলমানরা আধুনিক শিক্ষার দিকে অগ্রসর হয়েছে। এমনকি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি চাকরি করেছেন, সেটিও তো মুসলমান নেতাদের সংগ্রামের ফসল, বাঙালি মুসলমানকে এগিয়ে নেওয়ারই একটা পদক্ষেপ। কিন্তু হুসেন এতে সন্তুষ্ট নন। তিনি ও তার বন্ধু ওদুদ মনে করেন, তাদের প্রকৃষ্ট মডেল হওয়া উচিত রামমোহন। রামমোহন যেমন করে ধর্ম সংস্কার করে, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করে, ইংরেজের সহযোগিতা করে, হিন্দুসমাজের প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছেন, মুসলমানদেরও সেটাই হওয়া উচিত সম্ভাব্য প্রকল্প।

কিন্তু কেন রামমোহন? তিনি কি মুসলমানদের নেতা হওয়ার দাবিদার হতে পারেন? মুসলমান সমাজের জন্য তার কোনো অবদান নেই। আমরা রামমোহন সম্পর্কে এখন দুটি উদ্ধৃতি নেব—

(ক)

'১৯৪৫ সালের প্রবাসীতে সতীশচন্দ্র মৈত্র রচিত রামমোহন সম্পর্কিত একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠে জানা যায় যে, ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ ও মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে রামমোহন যে সভার আয়োজন করতেন তাতে মুসলমান শ্রোতাদের আসন নির্দিষ্ট হতো শামিয়ানার বাইরে এবং হিন্দুদের শামিয়ানার অভ্যন্তরে।' (মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ কৃত *বুদ্ধির মুক্তি ও রেনেসাঁ আন্দোলন*)

(খ)

'Having completed all arrangements for his departure, Rammohun sailed from Calcutta by the Albion on the 19th of November. Careful even in this daring innovation on Brahman custom, to observe the laws of caste, he took with him Hindu servants to prepare his food and two cows to supply him with milk....

Rammohun was also accompained by two Hindu servants, by name Ramhurry Doss and Ramrotun Mukherjee. The latter as cook was entrusted with the duty of providing his master with food prepared in accordance with caste regulations (Life and letters of Raja Rammohun Roy. Second Edition, Pages 169 and 171.)'

জাহাজে করে দুগ্ধবতী গাভী নিয়ে সুদূর বিলাত গমনের মধ্যে ব্রাহ্মণ রামমোহনের জাত বাঁচানোর কৌশলে স্বধর্মীরা হয়তো খুশি হয়েছিল কিংবা শামিয়ানার ভেতরে হিন্দু আর বাইরে মুসলমান ব্যাপারটাও জাত রক্ষা করেছিল হয়তো। কিন্তু এই জাতপাতের সম্পর্ক মেনে হিন্দু মুসলমানের যৌথ জাতীয়তার ভাবনা তো একটা অসম্ভব কল্পনামাত্র। এই রামমোহনের প্রতি হুসেন বা ওদুদের এত পক্ষপাত কেন? সৈয়দ আহমদ খান বা সৈয়দ আমীর আলীর প্রতিই-বা এত অপ্রীতি কেন? এ মুসলিম নেতারা আধুনিক শিক্ষা চেয়েছিলেন, তবে মুসলিম স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করতে চাননি। এটাই তাদেরকে রামমোহনের দিকে টেনেছিল। এরা বাঙালি মুসলমানকে রামমোহনের 'বাঙালি' বানাতে চেয়েছিলেন, যে বাঙালি কলকাতার হিন্দু রেনেসাঁর একজন অধঃস্তন অংশীদার হিসেবে থাকবে। এর বিরোধিতাকে তারা বলেছেন সাম্প্রদায়িকতা এবং বাঙালিত্বের সাধনার পথে এক প্রতিবন্ধক। সেকালে মৌলবাদ কথাটা চালু হয়নি। নয়তো সুযোগ থাকলে এ কথাটিও তারা ব্যবহার করতেন।

মুসলিম সাহিত্য সমাজ বাঙালি মুসলমানকে এক আত্মপরিচয়হীন প্রজাতিতে পরিণত করতে চেয়েছিল। মুসলিম সমাজ তাই সংগত কারণে সেদিন এদের কর্মসূচিকে অনুমোদন করেনি।

০৫

ওদুদ ও হুসেন—এই দুজনই মূলত শিখাগোষ্ঠীর বুদ্ধিবৃত্তিক কান্ডারি ছিলেন। এদের Conviction বা বিশ্বাস যথেষ্ট শক্ত ছিল। আধুনিক যুগে ইসলামের কার্যকারিতা নিয়ে তাদের সংশয় তো ছিলই, ইসলাম ও মুসলমান সমাজ নিয়ে হীনম্মন্যতাও ছিল। যদিও এরা দাবি করতেন চিন্তায় ও বিশ্বাসে তারা মুসলমান, রাসূলের প্রতি শ্রদ্ধাবান, কিন্তু এদের লেখালেখি তা সমর্থন করে না। ধর্মবিশ্বাসের দিক দিয়ে এরা কিছুটা সংশয়ী ছিলেন বলা যায়। ইসলামের ব্যাপারেও তাদের সংবেদনহীনতা অনেক সময় এদের লেখালেখিতে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে।

ওদুদ ও হুসেন ছাড়া শিখাগোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্য যেমন কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল ফজল ও মোতাহার হোসেন চৌধুরী এরা অনেকটা মধ্যপন্থি ছিলেন। ধর্ম নিয়ে এদের লেখায় যেমন সংশয়ের আভাস পাওয়া যায়, তেমনি অনেক ক্ষেত্রে সংবেদনশীলতাও লক্ষণীয়। অবস্থা ও পরিবেশের সাথে এরা অনেক সময় Accomodate করেছেন। আবার এদের চিন্তার ভেতরে বিভিন্ন সময় রূপান্তরও দেখা গেছে। ওদুদ বা হুসেনের মতো এরা Rigid ছিলেন না।

কাজী মোতাহার হোসেনের চিন্তাধারায় ওদুদ ও হুসেনের যথেষ্ট প্রভাব আছে। বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলনের প্রবাহকে তিনি আজীবন বয়ে নিয়ে বেড়িয়েছেন, এটাও সত্য। তবে মুসলমান মনোভঙ্গির প্রতি তিনি তুলনামূলকভাবে সংবেদনশীল ছিলেন। *শিখা* পত্রিকায় 'নাস্তিকের ধর্ম' বলে তিনি যে প্রবন্ধ লেখেন, সেখানে শাস্ত্রধর্মকে নয়, মানব ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ বলেছেন। তিনি বলেন—

> 'বর্তমানে জনসেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে পরিকীর্ত্তিত।...আমাদের প্রবৃত্তিগুলিকে অগৃহীত করে সতী না বানিয়ে ছাড়া দিয়ে যাতে তারা আপনা-আপনি সৎপথে চলতে পারে, তার ব্যবস্থা করাই প্রকৃত ধর্ম-সাধনা।'[১০]

এটা অবশ্য ধর্ম নিয়ে মোতাহারের একধরনের সংশয়ী চিত্তের কথা এবং একজন ধর্মবিশ্বাসীর পক্ষে এসব কথা বলা মোটেই সংগত নয়।

কাজী সাহেব 'আনন্দ ও মুসলমান গৃহ' নামে সে সময় একটি প্রবন্ধ লেখেন। তার মতামত এরকম—

> 'উন্নত চিন্তা ও আনন্দের তৃপ্তিতে চেহারায় যে লাবণ্য ও কমনীয়তা পরিস্ফুট হয়, তাহাও ইহাদের নাই। সুরুচির অভাবে হৃদয় ও মনের উন্নত বৃত্তিগুলি বিকশিত ও চরিতার্থ হইতে পারে না।'[১১]

কাজী সাহেব যথেষ্ট সংগীতানুরাগী ছিলেন। তার গৃহেও সংগীতের পরিবেশ ছিল। নিজের মেয়ে বিশেষ করে সানজিদা ও ফাহমিদাকে সংগীতজ্ঞ বানিয়েছিলেন। কিন্তু কালক্রমে এরা সংগীতের নামে শান্তিনিকেতনের সংস্কৃতি এ দেশে আমদানি করে। এটা কাজী সাহেবের স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা প্রমাণ করে না; বরং শিখাগোষ্ঠীর অপর আইডল রামমোহনের পাশে রবীন্দ্রনাথেরও রিনিঝিনি শোনা যায়।

আবুল ফজল ছিলেন মোল্লাবাড়ির ছেলে। তার আব্বা ছিলেন মসজিদের ইমাম, লেখাপড়া শুরু হয়েছিল মাদরাসাতে। ফজল স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন—তার আব্বা তার কাছ থেকে ওয়াদা করিয়েছিলেন, তিনি যেন জীবনে দাড়ি না কাটেন। পিতার প্রতি শ্রদ্ধাবশত তিনি আজীবন শ্মশ্রুমণ্ডিত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএ পড়তে এসে তিনি শিখাগোষ্ঠীর সহযাত্রী হন। তখন তারও ব্রত হয় বুদ্ধির মুক্তি। শিখাগোষ্ঠীর কাছে বুদ্ধির মুক্তি বলতে বোঝাত ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে মুক্তি, ধর্মের বিধিনিষেধ থেকে মুক্তি। শিখাগোষ্ঠীর বাতাবরণেই তার মানস বিকাশ হয়েছিল, এতে সন্দেহ নেই। ধর্ম নিয়ে তার একটা সংশয় যেমন ছিল, তেমনি টানাপোড়েনও ছিল। পারিবারিক ধর্মীয় পরিবেশের সাথে শিখাগোষ্ঠীর লিবারেল চিন্তাভাবনা তাকে একধরনের মানসিক দ্বন্দ্বে ফেলে দিত। তার উপন্যাস ও প্রবন্ধগুলোতে এ দ্বন্দ্বের ছাপ স্পষ্ট।

১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের আগে তিনি তার কাছে একটি চিঠি লেখেন। এ চিঠির মর্ম শিখাগোষ্ঠীর দেখা রবীন্দ্রনাথের মতো নয়। রবীন্দ্রনাথকে যে প্রশ্ন করার সাহস ওদুদ বা হুসেনের ছিল না, ফজল সেই সাহস অর্জন করেছিলেন। চিঠির কিয়দংশ উদ্ধৃতি দিই—

'আপনি লিখেছেন "বাঙলাদেশের আধখানায় সাহিত্যের আলো পড়েনি," অতি কঠোর সত্য কথা। যদি বেয়াদবি মনে না করেন তবে এ প্রসঙ্গে আমার ও আমার বন্ধুগণের দীর্ঘদিনের একটি প্রশ্ন উত্থাপন করি। বাঙলা সাহিত্যের অনির্বাণ ভাস্কর পর্যন্ত এ আধখানা বাঙলার দিকে ফিরে তাকাননি—রবির কিরণে বিশ্ব আলোকিত হয়েছে, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, বাঙলার মাটির আঙিনায় রবির আলোকপাত হলো না। এর যথাযথ কারণ আমরা ধারণা করতে পারছি না। শুনেছি গল্পগুচ্ছের অনবদ্য গল্পগুলো শিলাইদহে আপনাদের জমিদারিতে বসেই লেখা, শিলাইদহের মুসলমান প্রজামণ্ডলীর মধ্যে আপনার কি আসন তা শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায় চৌধুরীর প্রবন্ধ না পড়েও আমরা আন্দাজ করতে পারি, অথচ এদের জীবন আপনার কোনো সাহিত্য প্রচেষ্টার উপাদান হতে পারল না।'[১২]

এই ফজলকে আমরা দেখি পাকিস্তান আন্দোলনের সময় পাকিস্তানকে সমর্থন করতে। শুধু তা-ই নয়, কায়েদে আযমকে নিয়ে নাটক লিখতে। সেখানে তিনি জিন্নাহর আধুনিক, সবল নেতৃত্বের রূপকেই ফুটিয়ে তোলেন। পাকিস্তানের জন্মের মধ্যে তিনি কি কোনো মানবতন্ত্রের প্রত্যাশা করেছিলেন? পাকিস্তান তো ঘোষণা দিয়েই মুসলিম রাষ্ট্র। সে মানবতন্ত্রের পথে যাবে কেন? ফজল বিরক্ত হন, তিনি লেখেন *মানবতন্ত্র* নামে একটি প্রবন্ধের বই। মানবতন্ত্র মানে পশ্চিমের উদারনৈতিকতা আরেকটু প্রসারিত করে বললে ধর্মনিরপেক্ষতা, যার প্রতিপক্ষ ধর্ম।

আবার তিনি বুদ্ধির মুক্তির কাছাকাছি হন। মানবতন্ত্রের প্রচার চালিয়ে তিনি পাকিস্তানকেই অস্বীকার করতে চান। মানবতন্ত্রের পক্ষে তার অবস্থানের জন্য তার ভক্তরা তাকে বলত নাস্তিক। পাকিস্তানের বিদায়ের পর নতুন সরকারের দুর্বিনীত আচরণের জন্য তিনি ক্ষুব্ধ হন। তিনি লেখেন শুভবুদ্ধি। সরকারের মাদরাসা শিক্ষা বন্ধের উদ্যোগের তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেন। ফজলুল কাদের চৌধুরীর ইন্তেকালের পর তিনি তার প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং তার এপিকধর্মী বক্তব্য উচ্চারণ করেন—

'আমি মনে করি যার যা প্রাপ্য, তাকে তা দেওয়া উচিত। ইতিহাসের একপর্যায়ে ভারতীয় মুসলমানের জন্য পাকিস্তান আন্দোলন অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। সে আন্দোলনে ছাত্রনেতা ফজলুল কাদের গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা পালন করেছিলেন। আমি ইতঃপূর্বে একাধিক প্রবন্ধে লিখেছি—পাকিস্তান না হলে স্বাধীন বাংলাদেশ হতো না। বর্তমান বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গের অংশ হয়েই থাকত।'[১৩]

সম্ভবত ষাটের দশকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পক্ষে তার ভূমিকার জন্য মুজিব সরকার তাকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি বানায়। ৭৫'র পটপরিবর্তনের পর নতুন ইসলামঘেঁষা সরকার তাকে শিক্ষা উপদেষ্টা বানায়। তার এই নানা রকম ভূমিকার জন্য অনেকে তাকে বলেছেন সুবিধাক্রান্ত। তবে এটা সত্য যে, তার চিন্তাধারা ওদুদ ও হুসেনের মতো কোনো একটি নির্দিষ্ট পথ ধরে এগোয়নি। তার ভেতরে ছিল বিস্তর স্ববিরোধিতা। তিনি একসময় লিখেছেন মানবতন্ত্র। সেই তিনিই আবার লিখেছেন কোরানের বাণী। কোরানের বাণী গ্রহণের সাথে মানবতন্ত্রের বাণী মেলানো একটু কঠিন বৈকি।

তবে তরুণ বয়সে তিনি শিখাগোষ্ঠীর কাছ থেকে ধর্ম নিয়ে সংশয়ের যে দীক্ষা পেয়েছিলেন, তা আজীবন বহন করেছেন। সময়ে সময়ে এর তীব্রতা ওঠানামা করেছে কেবল। ইতিহাস শেষ পর্যন্ত তাকে একজন শিখাপন্থি হিসেবেই শনাক্ত করবে।

শিখাপন্থিদের সাথে যুক্ত থেকেও মোতাহের হোসেন চৌধুরী ধর্মকে মোকাবিলা করেছিলেন কিছুটা সংবেদনশীল মন নিয়ে। ওদুদ ও হুসেনের মতো ধর্মকে তিনি স্থূলভাবে আঘাত করেননি, কিন্তু ধর্মের প্রচলিত টেক্সটকে তিনি মনেপ্রাণে গ্রহণও করেননি। তার একটি উল্লেখযোগ্য বই হলো *সংস্কৃতি কথা*। এখানে 'আদেশপন্থি ও অনুপ্রেরণাপন্থি' বলে একটা প্রবন্ধ আছে। আদেশপন্থি বলতে তিনি শাস্ত্রপন্থিদের বুঝিয়েছেন। তার ভাষায়—যাদের কোনো সৃজনশীলতা নেই। তার মতে—যারা শরিয়তের আদেশ ডিঙিয়ে অন্তরের ইঙ্গিতে কাজ করেছেন, তারাই সৃষ্টি করতে পেরেছেন। এ তথ্যে চমৎকারিত্ব আছে, বাস্তবতা নেই। ধর্মের প্রেরণায় কি অসংখ্য আর্ট-কালচারের জন্ম হয়নি? মস্ক অব কর্ডোভা, ইউরোপের ডিভাইন কমেডি, বড়ো বড়ো গথিক ক্যাথিড্রাল—এসব কি ধর্মের প্রেরণার ফল নয়?

চৌধুরীর মতে—আদেশপন্থিরাই বাংলার মুসলমান সমাজের যাবতীয় দুর্গতির কারণ। এ কথাটা শিখাপন্থিদের সবার মনের কথা। বিভিন্ন সময়ে তারা এ কথাটাই চারিয়ে নিতে চেয়েছেন। সমাজ বাস্তবতার ধার না ধেরে। মুসলমান সমাজের প্রতি ঔপনিবেশিক অবিচারের কোনো বিশ্লেষণে না গিয়ে দিনের পর দিন তারা সব দুর্গতির জন্য ইসলামি শরিয়তকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন।

চৌধুরী ধর্মের মোকাবিলায় সংস্কৃতিকে দাঁড় করিয়েছিলেন। তার একটা অভিনব আবিষ্কার ছিল—

> 'ধর্ম সাধারণ লোকের কালচার, আর কালচার শিক্ষিত, মার্জিত লোকের ধর্ম। কালচার মানে উন্নততর জীবন সম্বন্ধে চেতনা-সৌন্দর্য, আনন্দ ও প্রেম সম্বন্ধে অবহিতি। সাধারণ লোকেরা ধর্মের মারফতেই তা পেয়ে থাকে। তাই তাদের ধর্ম থেকে বঞ্চিত করা আর কালচার থেকে বঞ্চিত করা এক কথা।
>
> ধর্ম মানে জীবনের নিয়ন্ত্রণ, মার্জিত আলোকপ্রাপ্তরা কালচারের মারফতেই নিজেদের নিয়ন্ত্রিত করে। বাইরের আদেশ নয়, ভেতরের সূক্ষ্ম চেতনাই তাদের চালক, তাই তাদের জন্য ধর্মের ততটা দরকার হয় না; বরং তাদের ওপর ধর্ম তথা বাইরের নীতি চাপাতে গেলে ক্ষতি হয়। কেননা, তাতে তাদের সূক্ষ্ম চেতনাটি নষ্ট হয়ে যায়, আর সূক্ষ্ম চেতনার অপর নাম আত্মা।[১৪]

চৌধুরী সাহেবের কথা মেনে নিলে আমাদের স্বীকার করে নিতে হয়, শিক্ষিত লোক ধার্মিক হতে পারে না। ওদুদের মতো চৌধুরীও উনিশ শতকের হিন্দু রেনেসাঁর গুণমুগ্ধ ছিলেন। এই রেনেসাঁর পথিকৃৎরা তো কমবেশি সবাই শিক্ষিত হয়েও ছিলেন হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী। চৌধুরীর সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যা এখানে টেকানো কঠিন। আসলে চৌধুরী ও তার সতীর্থরা মুসলিম মনের গড়ন না বুঝেই এখানে একটা ইউরোপীয় রেনেসাঁ আমদানি করতে চেয়েছিলেন। রেনেসাঁ বা রিফরমেশন যা-ই বলি না কেন, সেটা তো ইতিহাস-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য বাদ দিয়ে নয়। ইউরোপেও সেটা হয়নি। অথচ মুসলিম ঐতিহ্য ত্যাগ করে তারা বাঙালি মুসলমানের রেনেসাঁ চেয়েছিলেন। এটা তো একটা কাঁঠালের আমসত্ত্ব।

ধর্ম নিয়ে সংশয় থাকা সত্ত্বেও চৌধুরী পাকিস্তান আন্দোলনের সময় কায়েদে আজমের নেতৃত্ব ও পাকিস্তানের ন্যায্যতার প্রশ্নে সরব হয়ে ওঠেন। 'কায়েদে আজম জিন্দাবাদ' বলে তিনি একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন—যা জিন্নাহর ব্যক্তিত্ব, আধুনিকতা ও রাজনৈতিক যুক্তির সারবত্তাকে প্রমাণ করে। আমি উদ্ধৃতি দিই—

> 'এখন প্রশ্ন ওঠে, হিন্দু-মুসলমানের এই যে বিরোধ, এর জন্য দায়ী কে? এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলতে হয়। তবে একটা কথাই এখানে বিশেষভাবে মনে পড়ছে; এবং সেটাই বলছি। এই বিরোধের গোড়ায়

রয়েছে হিন্দু জাতীয়তার স্বপ্ন। হিন্দুরা শুধু ইংরেজের কবল থেকে ভারতের মুক্তি কামনা করেনি, হিন্দু ঐতিহ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠারও কামনা করেছিল। কংগ্রেসের গায়ে শেষ পর্যন্ত যে রংটা লাগল, তা তো এই হিন্দু জাতীয়তার রং, আর এই রঙের পূজাই শেষ পর্যন্ত সার্থক ভারত জাতীয়তার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। মুসলমানরা দেখল এখানে তাদের ঐতিহ্যের মৃত্যু, তাই ধীরে ধীরে জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসহারা হয়ে পড়ল। ফলে এই বিভাগ।'[১৫]

মানুষের মনের পরিবর্তন হয়। তার ভেতরেও কি পরিবর্তনের রেখা দেখা দিয়েছিল?

০৬

মুসলিম সাহিত্য সমাজ ও তার নেতা কর্মীরা এ দেশে প্রথম বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিকভাবে ইসলামকে মোকাবিলা করা শুরু করে। ইসলামের থিওলজিকাল বিষয়-আশয় নিয়েও প্রশ্ন শুরু করে। শিখাগোষ্ঠীর সাথে যারা যুক্ত ছিলেন, তারা কেউই শাস্ত্রবিদ বা আলেম ছিলেন না। ইসলামের থিওলজিকাল বিষয়ে তাদের যে খুব গভীর অধিকার ছিল, এমন বলা যাবে না। তারপরেও তারা থিওলজিকাল বিষয়ে অনধিকারচর্চাই করেছিলেন বলা চলে। আধুনিক কালে ইসলামের অকার্যকর হয়ে যাওয়া, ইসলামি শরিয়তের অংশত বর্জন, রাসূল (সা.)-এর নবুয়তকে গুরুত্বহীন মনে করা প্রভৃতির মতো বেপরোয়া কথাবার্তাও তারা বলেছিলেন।

ইসলাম ধর্ম ও ধার্মিকতাকে তাদের কাছে গোঁড়ামি, রক্ষণশীলতা, অন্ধ বিশ্বাস, আড়ষ্ট বুদ্ধি, অতীতমুখিতা বলে মনে হয়েছিল। মনে হয় তাদের যত ক্ষোভ ছিল মোল্লা-মৌলভিদের ওপর। তাদের মনে হয়েছিল, এরাই ইসলামকে পিছু টেনে ধরেছে। তাই মধ্যযুগে ইউরোপের চার্চের মতো মোল্লাতন্ত্রকে তারা আক্রমণ করেছিলেন। মুশকিল হচ্ছে, চার্চের মতো ইসলামে মোল্লাতন্ত্রের কোনো জায়গা নেই এবং কখনো ছিল না। আলেমরা আমাদের সমাজে ইসলামি নৈতিকতার ঝান্ডাটি ঐতিহাসিক কাল ধরে উঁচু করে ধরে আছেন। হয়তো এটাই ছিল তাদের বিরাগের কারণ।

বাঙালি মুসলিম সমাজের পিছিয়ে পড়ার প্রধান কারণ ছিল ঔপনিবেশিক জুলুম ও প্রতিকূলতা। আশ্চর্য হয়ে যাই, শিখাগোষ্ঠীর লেখকরা ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করেননি; বরং কখনো কখনো ইংরেজদের প্রতি অনুরাগের প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে শিখাগোষ্ঠীর ইসলামকে নিয়ে অপ্রীতি প্রকট অন্ধতার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। তাই 'যা কিছু হারায়, কেষ্ট বেটাই চোর'-এর মতো ইসলামের দিকেই এরা নির্বিচারে তির নিক্ষেপ করে গেছেন। ওদুদের *বাংলার জাগরণ* গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে হুমায়ুন কবির এই অন্ধতার দিকে ইঙ্গিত করে লিখেছেন—

> 'সত্যের সন্ধানের মধ্যেও কিন্তু বারবার জাতীয় অভিমান, সামাজিক সংকীর্ণতা এবং অন্যান্য ধরনের মানবধর্ম বিরোধী মনোভাব এসে পড়ে। বাংলাদেশের জাগরণের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

> যারা বুদ্ধির মুক্তির দোহাই দিয়েছেন, তাঁরাও বহুক্ষেত্রে মনেপ্রাণে সংস্কারের দাস, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সে—সংস্কার বিদেশজাত, কিন্তু স্বদেশিই হোক, আর বিদেশিই হোক, যেখানে বুদ্ধির সহজ প্রবাহকে আচার বা অভ্যাসে ব্যাহত করেছে, সেখানেই মানবধর্ম ঘা খেয়েছে। যারা বুদ্ধির মুক্তি ও মানব কল্যাণকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছেন, তাঁদেরও সময় সময় পদস্খলন হয়েছে।'[১৬]

বলাই বাহুল্য, আমাদের সমাজে শিখাগোষ্ঠীর লেখকরাই প্রথম সাংস্কৃতিকভাবে ইসলাম নিয়ে সংশয়, সন্দেহ ও হীনম্মন্যতা তৈরি করে। হয়তো বলা যায়, কিছুটা নাস্তিকতাও প্রচার করে। আজকে আমাদের মধ্যবিত্তের মধ্যে ইসলাম নিয়ে যে টানাপোড়েন দেখি, তার প্রথম বীজ রোপিত হয় এদের হাতেই।

শিখাগোষ্ঠীর চিন্তাভাবনা সমকালে কেউ গ্রহণ করেনি। কিন্তু এদের যুক্তি ভাষা পেয়ে যায় এ দেশে ভাষা আন্দোলনপরবর্তী ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রকট উত্থানের ভেতর। ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের বুদ্ধিবৃত্তিক মডেলটা নেওয়া হয়েছিল কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু রেনেসাঁর শাঁস থেকে। শিখার মডেলও ছিল হিন্দু রেনেসাঁ।

ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের নামে যে সেকুলার চিন্তার বিকাশ ঘটে, তার পেছনে শিখার যুক্তিগুলোই অনেকখানি কার্যকর ছিল। ১৯৬০-এর দশকে বদরুদ্দীন উমরের লেখা *বাঙালি মুসলমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন* এবং ১৯৮০-এর দশকে আহমদ ছফার লেখা *বাঙালি মুসলমানের মন*-এ যে যুক্তি সাজিয়ে বাঙালি মুসলমানকে শাপশাপান্ত করা হয়েছে, তার বহু কিছু শিখার চিন্তা থেকে আহরিত। বিশেষ করে এ দুটো লেখার পূর্বসূরি হিসেবে ওদুদের *সম্মোহিত মুসলমান*-এর কথা বলা যেতে পারে।

ভাষা আন্দোলনপরবর্তী বাঙালি জাতীয়তাবাদকে কেন্দ্র করে যে বুদ্ধিবৃত্তিক সিলসিলা তৈরি হয়েছে, তা শিখারই বিলম্বিত স্বপ্ন পূরণ মাত্র। এই সিলসিলার মধ্যে আছেন আবদুল হক, আহমদ শরীফ, বদরুদ্দীন উমর, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আনিসুজ্জামান, হাবিবুর রহমান, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর প্রমুখ। এদের চিন্তাচর্চার মধ্যে ইসলাম নেই। ইসলামকে কোনোভাবেই এরা আত্মপরিচয়ের অংশ হিসেবে মনে করেন না; ইসলামকে ভিত্তি করে রাষ্ট্র, জাতীয়তাবাদ, সংস্কৃতির বিকাশ তো দূরের কথা। আজকে ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের নামে বাঙালি মুসলমানের মধ্যে ভাষা

ও ধর্মের ভেতরে লড়াই বাধিয়ে যে রক্তাক্ত বিভাজন তৈরি করা হয়েছে, তার আদি উৎস খুঁজতে হবে শিখার চিন্তাভাবনার মধ্যে।

শিখার সমকালে এর লেখকরা ইসলামকে গোঁড়ামি, রক্ষণশীলতা ও অতীতমুখিতার সাথে যুক্ত করে দেখতেন। ৭০-৮০'র দশক থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির নানা সমীকরণে এটাকেই বলা হতে লাগল মৌলবাদ। 'ওয়ার অন টেররের' কালে এসে এখন বলা হচ্ছে জঙ্গি-সন্ত্রাসবাদ। আসলে পরিভাষা যাই হোক, ইসলামোফোবিয়ার চেতনা একই রকম আছে। এখন যারা শিখার সিলসিলা বহন করে, এরা আজও এ শব্দগুলো ব্যবহার করেই ইসলামের সাথে মোকাবিলা করার চেষ্টা করে। এদিক দিয়ে শিখাগোষ্ঠীর চেতনাকে বাঙালি মুসলমান সমাজের কামালিজম বলা যেতে পারে।

বাঙালি মুসলমান ঐতিহাসিক কাল ধরেই ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের সাথে নিজেদের আত্মপরিচয়কে কখনো শনাক্ত করেনি। ভাষা তাদের কখনোই পরিচয়ের মাপকাঠি হয়নি। তাদের প্রথম পরিচয় ছিল ইসলাম। দ্বিতীয় পরিচয় ছিল ভূখণ্ড। সুলতানি আমল থেকে এই ভূখণ্ডগত পরিচয়ের সূচনা। ভাষা আন্দোলনের পর থেকে কেবল ভাষাভিত্তিক পরিচয়কে নানা রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সমীকরণের ফলে কৃত্রিমভাবে বিবর্শিত করে তোলা হয়। এই ভাষিক পরিচয়ের আধ্যাত্মিক-সাংস্কৃতিক মাত্রা তৈরি হয়েছে কলকাতার হিন্দু রেনেসাঁর অনুকরণে। এটা পূর্ব বাংলার বাঙালি মুসলমানের পরিচয় নয়। এটা সম্পূর্ণ আরোপণমূলকভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ওপর থেকে চাপিয়ে দিয়ে বাঙালি মুসলমানের সর্বনাশ করা হয়েছে। এই সর্বনাশের প্রথম কারিগর হলেন শিখাগোষ্ঠীর ভাবুকরা।

হদিস

১. রইসউদ্দিন আরিফ, *আত্মবিস্মৃত বাঙালী*। ঢাকা : বুককমাস্টার, ২০২১

২. আবদুল কাদির, *কাজী আবদুল ওদুদ*। ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬

৩. আবদুল হক, '*কাজী আবদুল ওদুদ : রাষ্ট্রচিন্তা*', *ওদুদ চর্চা* (সাঈদ-উর-রহমান সম্পাদিত)। ঢাকা : একাডেমী পাবলিশার্স, ১৯৮২

৪. *মাসিক মোহাম্মদী*, ফাল্গুন, ১৩৩৪

৫. *চতুরঙ্গ*, বৈশাখ, ১৩৬৪

৬. আবদুল কাদির, *কাজী আবদুল ওদুদ*।

৭. প্রাগুক্ত।

৮. অন্নদাশঙ্কর রায়, 'কাজী আবদুল ওদুদ', চক্রবাল, *প্রবন্ধ সমগ্র*, ষষ্ঠ খণ্ড। কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি, ১৪০৬

৯. শিখা, ঢাকা চৈত্র, ১৩৩৩

১০. শিখা, ১৯৩১

১১. শিখা, ১৯২৮

১২. আবুল ফজল, *সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবন*। চট্টগ্রাম : বইঘর, ১৯৬৮

১৩. আবুল ফজল, শুভবুদ্ধি, ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৮৫

১৪. মোতাহের হোসেন চৌধুরী, *সংস্কৃতি কথা*। ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯৬

১৫. মোতাহের হোসেন চৌধুরী, 'কায়েদে আযম জিন্দাবাদ', *মোতাহের হোসেন চৌধুরী রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫

১৬. *চতুরঙ্গ*, বৈশাখ, ১৩৬৪

আবদুর রাজ্জাক থেকে আহমদ ছফা : সেকুলারিজমের পালাবদল

০১

অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম জামানার ছাত্র ও পরবর্তীকালে শিক্ষক। সেই কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্র ও শিক্ষক ছিল হাতে গোনা। তখন মুসলমানরা হিন্দু আধিপত্যের সামনে প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে বলা চলে। রাজ্জাকের ভাষায়—

> 'আমরা তখন বেশির ভাগ ধূতি-শার্ট পরতাম। তখনকার পিরিয়ডে দি মুসলিমস ওয়েয়ার কমপ্লিটলি সোয়েফট ওভার।'[১]

রাজ্জাক ব্রিটিশ আমলের শেষটা দেখেছেন। তারপর পাকিস্তান আমলের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশে পৌছেছেন। তাই তার এক জীবনে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বাস্তবতার রূপান্তরগুলো চোখে ধরা দিয়েছে এবং তিনিও অবস্থার সাথে মিলিয়ে কখনো কখনো বদলে গেছেন।

রাজ্জাকের ভেতরে কিছু ব্যতিক্রমী চরিত্র ছিল। তিনি সব সময় ঢাকাইয়া জবানে কথা বলতেন। এতে তার কোনো লজ্জা ছিল না। যেখানে তার বন্ধুবান্ধব ও শিষ্যকুল কলকাতাইয়া প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারলে উতরে যেতেন, সেখানে এসবের প্রতি তার কোনো ভ্রুক্ষেপ ছিল না। ভদ্রলোক সাজার মরিয়া চেষ্টা তার মধ্যে বড়ো একটা দেখা যায়নি। ওই কলকাতাইয়া প্রমিত বাংলা নিয়েও তার নিজের মতো একটা বিচার ছিল—

> 'আধুনিক বাংলা বঙ্গ সন্তানের ঠিক মুখের ভাষা না, লেখাপড়া শিইখ্যা লায়েক অইলে তখনই ওই ভাষাটা তার মুখে আসে।'[২]

এই ঢাকাইয়া জবান ও সাধারণ জীবনযাপন সত্ত্বেও দেশে তার বিস্তর প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। সমাজের উঁচু শ্রেণির সাথেই তার চলাফেরা ও খায়খাতির ছিল। তার শিষ্যকুলও ছিল সামাজিকভাবে প্রচণ্ড প্রভাবশালী। শিষ্যকুল তাকে ডায়জিনিস বলে ডাকতেন। হয়তো তার ওই ব্যতিক্রমী চরিত্রের জন্য।

ক্লাসিক্যাল টিচার বলতে যা বোঝায়, তিনি তা ছিলেন না। ছাত্র পড়ানো, ক্লাসে লেকচার দেওয়া, এগুলো তার ধাতে ছিল না। এসব না করার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে তার ঘনঘন বিরোধ হতো। কিন্তু শ্রেণিগত ও সামাজিক মর্যাদার কারণে তার অবস্থানের কখনো হেরফের হয়নি।

তবে তিনি মজলিসি আলোচনায় ছিলেন পারঙ্গম এবং এ ধরনের আলোচনা তার ভক্তকুলের কাছে রীতিমতো উপভোগ্য হয়ে উঠত। এসব বৈঠকী আলোচনায় তিনি তার চিন্তাভাবনাকে প্রসারিত করতেন ও ভক্তকুলকে কাছে টানতেন। জ্ঞানজগতের সাথেও তার একধরনের যোগাযোগ ছিল এবং দুনিয়ার পরিবর্তনগুলো সম্বন্ধে তার সজাগ দৃষ্টি ছিল। কিন্তু অ্যাকাডেমিক অর্থে যে জ্ঞানচর্চা, তার দিকে তার তেমন আগ্রহ ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি সক্রিয়ভাবে শিক্ষক রাজনীতিতে লিপ্ত থাকতেন এবং দেনদরবার নিয়েও তাকে ব্যস্ত থাকতে দেখা যেত।

জীবনে তিনি তেমন কোনো লেখাজোখা করেননি। এ কারণে তার শ্রেণিবদ্ধ চিন্তার কোনো নমুনা আমাদের কাছে নেই। তিনি তার মজলিসি ঢঙে যেসব আলোচনা করেছেন, তার কিছু নিয়ে আলাপচারিতা ও কথোপকথনের ঢঙে গ্রন্থবদ্ধ করেছেন তার দুই বিদগ্ধ শিষ্য সরদার ফজলুল করিম ও আহমদ ছফা। সরদারের বইটির নাম *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ববঙ্গীয় সমাজ* এবং আহমদ ছফার বইটি হলো *যদ্যপি আমার গুরু*। একে শ্রেণিবদ্ধ আলোচনা না বলে বলা যায়—Stray reflections—বিক্ষিপ্ত ভাবনারাজি।

কিন্তু আবদুর রাজ্জাকের কৃতি অন্যখানে, অন্তত তার বিদগ্ধ শিষ্যরা তাই মনে করেন। ভাষা আন্দোলন উত্তর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে ৬০ ও ৭০ দশকে যে সেকুলার বাঙালি জাতীয়তাবাদী ভাবনাচিন্তার বিকাশ ঘটে, তিনি তার সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব দেন। বাংলাদেশকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন

করে আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার ধারণাটি তার মাথা থেকেই আসে। পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ এটি গ্রহণ করে।

তার শিষ্যকুলের মধ্যে পশ্চিমা উদারনৈতিক বুর্জোয়া, কমিউনিস্ট ও পাড় ভারতপন্থি সব জাতের লোকই ছিল। রেহমান সোবহান, কামাল হোসেন ও নুরুল ইসলামের মতো পশ্চিমাঘেঁষা; সরদার ফজলুল করিম, বদরুদ্দীন উমরের মতো পাড় কমিউনিস্ট, আনিসুজ্জামানের মতো ভারতপন্থি, ছফার মতো তরুণ সমাজতন্ত্রী—সবাই তার আখড়ায় জমায়েত হয়েছিল। ওদিকে রেহমান সোবহান ও কামাল হোসেন ছিলেন উর্দুভাষী। মোটকথা, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর যে সমস্ত বুদ্ধিজীবী বাংলাদেশের জন্ম প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত হন বা নেতৃত্ব দেন, রাজ্জাক তাতে শুধু নেতৃত্বই দেন না-পুরো প্রক্রিয়াটিকেই তিনি সমন্বয় করেন।

দ্বিজাতিতত্ত্ব ভুল, মুসলিম লীগের রাজনীতি সাম্প্রদায়িকতা, টু ইকোনামির ধারণা—এসব চিন্তাভাবনা তার বাড়ির ড্রইংরুমে তৈরি হয় বলে শোনা যায়। প্রধানত তার পশ্চিমাঘেঁষা শিষ্যরা টু ইকোনমির আড়ালে বাঙালি জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক পটভূমি এবং কমিউনিস্ট ও ভারতপন্থি শিষ্যরা সাংস্কৃতিক পটভূমিকে কাঠামোগত রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে। কথা হলো—এই বিচিত্র ধরনের শিষ্যকুলকে তিনি কীভাবে সমন্বয় করেছিলেন?

তখনকার জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির সমীকরণে তার এই বিচিত্র শিষ্যকুল মুসলিম জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল এবং পাকিস্তানকে ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশ হওয়ার পর দেখা গেল, ভারতপন্থি বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা অন্যদের টেক্কা দিয়ে এগিয়ে গেছে, যার ফলে কমিউনিস্টদের রেডিকাল সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন ও উদারনৈতিকদের পশ্চিমা মডেলের সেকুলার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভাবনা সব বেহাত হয়ে গেছে। এ রকম পরিবর্তনে রাজ্জাকের প্রতিক্রিয়া অনেকটাই নৈর্ব্যক্তিক। ভেতরে দোলাচল থাকলেও তার কোনো প্রতিক্রিয়া আমরা দেখি না। এ সময় অনেকটা প্রতিক্রিয়াহীন নৈর্ব্যক্তিকতার ভেতরে উপমহাদেশের রাজনীতিকে দিল্লির হাতে তুলে দেওয়ার তিনি এক নীরব অংশীদার হয়ে থাকেন।

মজার ব্যাপার হলো, আবদুর রাজ্জাক পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছিলেন। তিনি মুসলিম লীগ নেতা ফজলুর রহমানের নির্বাচনি প্রচারে কীভাবে পায়ে হেঁটে কাজ করেছিলেন, তার এক সরস বর্ণনা দেখতে পাই সরদার ও ছফার বইতে। তিনি কী কারণে পাকিস্তান দাবির

পক্ষে সমর্থন জানিয়েছিলেন, তারও এক মজার কৈফিয়ত দিয়েছিলেন আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে ইসলামিক একাডেমিতে দেওয়া এক বক্তৃতায়। সে বক্তৃতার এক বয়ান আমরা দেখি ছফার জবানিতে—

> 'আমি কইছিলাম আপনেরা বাংলায় যত উপন্যাস লেখা অইচে সব এক জায়গায় আনেন। হিন্দু লেখক মুসলমান লেখক ফারাক কইরেন না। তারপর সব উপন্যাসে যত চরিত্র স্থান পাইছে রাম, শ্যাম, যদুমধু, করিম-রহিম নামগুলো খুঁইজ্যা বাইর করেন। তখন নিজের চৌকেই দেখতে পাইবেন, উপন্যাসে যেসব মুসলমান নাম স্থান পাইছে তার সংখ্যা পাঁচ পার্সেন্টের বেশি অইব না। অথচ বেঙ্গলে মুসলিম জনসংখ্যার পরিমাণ অর্ধেকের বেশি। এই কারণেই আমি পাকিস্তান দাবির প্রতি সমর্থন জানাইছিলাম।...
>
> আপনে এখন ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কথা কইতাছেন তখন সিচুয়েশন আছিল এক্কেবারে অন্যরকম। আরেকটা জিনিস মনে রাখবেন, উপন্যাস অইল গিয়া আধুনিক সোশিয়াল ডিসকোর্স। বেঙ্গলে হিন্দু মুসলমান শত শত বছর ধইর‍্যা পাশাপাশি বাস কইর‍্যা আইতাছে। হিন্দু লেখকেরা উপন্যাস লেখার সময় ডেলিবারেটলি মুসলমান সমাজ ইগনোর কইরা গেছে। দুয়েকজন ব্যতিক্রম থাকলেও থাকবার পারে। বড়ো বড়ো সব হিন্দু লেখকের কথা চিন্তা কইর‍্যা দেখেন। তারা বাংলার বায়ু, বাংলার জল এই সব কথা ভালা কইর‍্যাই কইয়া গেছে। কিন্তু মুসলমান সমাজের রাইটফুল রিপ্রেজেনটেশনের কথা যখন উঠছে সকলে এক্কেরে চুপ। মুসলমান সমাজরে সংস্কৃতির অধিকার থেইক্যা বঞ্চিত করার এই যে একটা স্টাবর্ন অ্যাটিটিউড হেই সময়ে তার রেমেডির অন্যকোন পন্থা আছিল না।'[৩]

বাংলা উপন্যাসের উদাহরণ দিয়ে রাজ্জাক অবশ্য পাকিস্তান আন্দোলনের পক্ষে একটা সমাজতাত্ত্বিক-অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা হাজির করেছিলেন এবং এই ব্যাখ্যার সারবত্তাকে চাইলেই সহজে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এখন পাকিস্তানকে তিনি আদর্শিক কারণে অথবা অর্থনৈতিক বাস্তবের সুরাহা হিসেবে কেন গ্রহণ করেছিলেন—সেই আলোচনা আমরা করব। তবে তার আগে চিন্তাগতভাবে তাঁর মুসলিম জাতীয়তাবাদ থেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদে রূপান্তর বিষয়ে আরও কিছু বর্ণনা আমরা দেখতে চাই। এ বর্ণনাটা আমরা পাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একসময়ের মেধাবী শিক্ষক সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের

জবানিতে। সাজ্জাদের সাথে রাজ্জাকের একসময় খুব অন্তরঙ্গতা ছিল, কিন্তু আদর্শিক কারণে এই অন্তরঙ্গতা পরবর্তী সময়ে মতান্তরে—এমনকি মনান্তরে পরিণত হয়। তারপরেও সাজ্জাদের এ বয়ান পক্ষপাতদুষ্ট হয়নি। সাজ্জাদের ভাষায় রাজ্জাক ছিলেন পাকিস্তান আন্দোলনের সময় A fanatical admirer of the Quid-e-Azam.

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান আন্দোলনের সাংস্কৃতিক সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সংসদের তিনি ছিলেন প্রধান তাত্ত্বিক এবং নাজির আহমদ সম্পাদিত পত্রিকা *পাকিস্তান*-এর অন্যতম উপদেষ্টা। সাম্প্রদায়িক হিন্দুদের হাতে নাজির খুন হওয়ার পর তিনি এক মর্মস্পর্শী শোক নিবন্ধ লেখেন।[৪]

এরপরে সাজ্জাদ আমাদেরকে যে রাজ্জাকের সন্ধান দেন, তা এক নতুন রাজ্জাক। এতদিনে রাজ্জাকের পুরোপুরি রাজনৈতিক ধর্মান্তর ঘটেছে। তিনি লিখেছেন—

> 'এটা ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময়ের কথা। ভারত হঠাৎ করে লাহোর ফ্রন্টে আক্রমণ করে যখন এই যুদ্ধ শুরু করে তখন পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠে, ঠিক তখনই একদিন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আমার অফিসে আবদুর রাজ্জাক সাহেব প্রবেশ করে প্রস্তাব করেন যে, আমি যেন বাঙালি জাতির ইতিহাস একটি লিখি। আমি তাকে বলেছিলাম, আমরা তো দুটি বাঙালি জাতির কথা জানি। হিন্দু বাঙালি জাতি এবং মুসলিম বাঙালি জাতি। এদের মধ্যে ভাষাগত এবং কিছুটা নৃতাত্ত্বিক মিল ছাড়া আর তো কোনো ঐক্য নেই এবং বহুকাল ধরে রাজনীতির ক্ষেত্রে এদের বিরোধ বাংলার ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে। সুতরাং ঐক্যবদ্ধ একটি বাঙালি জাতির পরিচয় কোথায়?
>
> এ প্রশ্নের সোজাসুজি কোনো জবাব না দিয়ে অধ্যাপক বললেন, পাকিস্তানের আদর্শ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং নতুন করে একটি সমাধান খুঁজতে হচ্ছে। তিনি মনে করেন, বাংলা আসামকে নিয়ে একটি বাঙালি রাষ্ট্র কায়েম করেই এ সমস্যার সমাধান করা যাবে। কথা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে উঠলাম। যে জবাব দিয়েছিলাম, তাও আমার স্পষ্ট মনে পড়ছিল। আমি তাকে বলি, পাকিস্তান আন্দোলন যখন শুরু হয় তখন আমরা ছাত্র। আপনাদের মতো

শিক্ষকেরাই এ আন্দোলনে আমাদের টেনে এনেছিলেন। সুতরাং কেনো পাকিস্তানের প্রয়োজন হয়েছিল তা আপনার কাছে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আমার নেই।

আজ পাকিস্তানের বয়স মাত্র ১৭ বছর। আপনি কি বলবেন, যে আদর্শের অনুপ্রেরণায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ১৭ বছরের মধ্যেই তার চূড়ান্ত পরীক্ষা হয়ে গেছে? আর যদি কোনো জাতি প্রতি ১৭ বছর তার রাষ্ট্রীয় কাঠামো ভেঙে-চুরে নতুন করে গড়তে চায় তাহলে এর শেষ কোথায়? পরবর্তী ১৭ বছরের পর আরেক জেনারেশনের তরুণেরাও তো প্রশ্ন করতে পারে, যে বাঙালি রাষ্ট্রের কথা আপনি বলছেন তাও আমাদের রাজনৈতিক উপযুক্ত সমাধান নয়। এই ভাঙাচোরার প্রক্রিয়া কি নিরন্তরই চলতে থাকবে? পাকিস্তানের বয়স যদি অন্তত পঞ্চাশ বছর হতো এবং পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে আপনি ঘোষণা করতেন, ওই আদর্শ নিষ্ফল বা ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে, আপনার কথার কিছুটা গুরুত্ব দিতাম, কিন্তু ১৭ বছরের মধ্যেই আপনি মত পালটালেন কেন?

আমার যুক্তির কোনো উত্তর তিনি সেদিন দেননি। তবে এরপর থেকে তিনি আমার সঙ্গে বাক্যালাপ প্রায় বন্ধ করে ফেলেন। এবং এর কিছুদিন পর আমাকে দেখলে রীতিমতো মুখ ঘুরিয়ে ফেলতেন।'[৫]

রাজ্জাকের এই রূপান্তরে সাজ্জাদ নিশ্চয় খুব দুঃখ পেয়েছিলেন। সাজ্জাদের মতে রাজ্জাক আদর্শিক দিক বিবেচনা করেই পাকিস্তান আন্দোলনে সমর্থন দেন। তার এই আদর্শিক রূপান্তর প্রসঙ্গে সাজ্জাদের মূল্যায়ন—

'To this day, I feel puzzled when I think of Mr. Razzaq's volte face. How could he have disowned his own early history, forgotten his own research on the subject of Hindu-Muslim relations and had even told me on one occasion that he would prefer to have beheaded in a Muslim theocracy rather than support a united India?'[৬]

সাজ্জাদের এই বিবৃতি কিছুটা দীর্ঘ হলেও রাজ্জাককে বোঝার জন্য বেশ জরুরি ও কাজের। বিশেষ করে উঠতি বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের মানসিক রূপান্তর, পাকিস্তান নিয়ে একবার তাদের উচ্চাশা, পরবর্তী সময়ে

হতাশা এবং শেষমেশ বাংলাদেশ পর্বে এসেও তাদের আশা-নিরাশার দোলাচলের ভেতরে যেন রাজ্জাকের ব্যক্তিত্বের রূপটিই ফুটে উঠেছে। একদিকে মতাদর্শ আবার অন্যদিকে বাস্তব সুবিধাজনক কূপমণ্ডুকতার টানাটানির মধ্যে রাজ্জাককে যেতে হয়েছে।

হিন্দু আধিপত্যের এক বাংলায় বড়ো হয়ে ওঠার অভিজ্ঞতা রাজ্জাকের হয়েছিল। এই আধিপত্য থেকে মুক্তির জন্য তিনি পাকিস্তান চেয়েছিলেন বটে, কিন্তু ওই আধিপত্যকে সংস্কৃতির জায়গায় পুরোপুরি মোকাবিলা করতে না পারায় তিনিও হীনম্মন্যতা থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেননি। তাই জিন্নাহভক্ত মুসলিম লীগার রাজ্জাক যে প্রেরণায় পাকিস্তান আন্দোলন করেছিলেন, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তিনি সেই প্রেরণা হারিয়ে ফেলেন এবং আধুনিকতা, প্রগতিশীলতা ও অসাম্প্রদায়িকতার নামে যে বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির উত্থান ঘটে, তার বিকাশে নেতৃত্ব দেন।

বাংলাদেশে সেকুলার চিন্তাভাবনার সাথে পাকিস্তান আন্দোলনের যে বিরোধমূলক অবস্থান আছে, সেখানে কি রাজ্জাক তার অবস্থানকে স্পষ্ট করতে পেরেছেন? অন্তত ছফার বইটি পড়লে রাজ্জাকের ভেতরে আমরা একটা দ্বিধার খবর পাই। বাস্তব রাজ্জাক ও ছফার রাজ্জাকের ভেতরে কি কোনো বিরোধ আছে? মুসলিম জাতীয়তাবাদী রাজ্জাক ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজ্জাক তো দুটো বিপরীতমুখী অবস্থান—এ দুয়ের মধ্যে ছফা কীভাবে সমন্বয়ের রেখা এঁকেছেন? এর চেয়ে বরং এটাই সত্য, ছফা বোধ হয় বাংলাদেশের ভাবজগতে সেকুলারিজম, সাম্প্রদায়িকতা, ভারত বিভাগ, পাকিস্তান প্রভৃতি বিষয়ে যে বিতর্কমূলক অবস্থা আছে, সে প্রেক্ষিতে তিনি রাজ্জাকের মুখ দিয়ে কিছু কথা বলিয়ে নিতে চেয়েছেন।

ছফা ও সরদার উভয়েই তাদের বইয়ের ভেতরে একটা অন্তর্গত রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক লক্ষ্য চাপা রেখেছেন—এটা বোঝা যায়। তবে ছফার বইয়ে তার লেখার গুণে যে উত্তাপ ছড়িয়েছে, সরদারের বইয়ে সেটা নেই। উলটো সরদারের বইয়ে কিছু তথ্যবিভ্রাট আছে। বিশেষ করে রাজ্জাক সাহেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় ঢাকার নওয়াবদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে ছোটো করে দেখিয়েছেন—যা ঐতিহাসিক দলিলনির্ভর নয়।

রাজ্জাক ১৯৪৫ সালে বিলাত যান পিএইচডি করার জন্য। তার সুপারভাইজার ছিলেন হ্যারল্ড লাস্কি। ইহুদি বংশোদ্ভূত লাস্কি ছিলেন রাজনীতিবিজ্ঞানের প্রথিতযশা অধ্যাপক। তিনি ছিলেন চিন্তাভাবনায় সমাজতন্ত্রী, কমিউনিস্ট পার্টির

মেম্বার, নেহরুর গুণগ্রাহী আবার একই সাথে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোর সমর্থক। রাজ্জাক বলেছেন, শিক্ষক হিসেবে লাস্কির একটা গুণ ছিল—তিনি ছাত্রদের চিন্তায় ধাক্কা দিতে পারতেন। অনেকের ধারণা এই লাস্কির প্রভাবেই রাজ্জাক মুসলিম জাতীয়তাবাদী চিন্তা থেকে সরে আসেন ও সেকুলার চিন্তাভাবনার দিকে অগ্রসর হন। লাস্কি রাজ্জাককে কাছে টানতে পারলেও পিএইচডি দিতে পারেননি। এর একটা কারণ ধারাবাহিকভাবে অ্যাকাডেমিক জ্ঞানচর্চা রাজ্জাকের ব্যক্তিত্বে ছিল না। কাঠামো ও পদ্ধতিগত ত্রুটির জন্য তিনি তার থিসিসকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমোদন করাতে সমর্থ হননি।

তার থিসিসের বিষয় ছিল 'Political Parties in India'। এখানে তিনি বলার চেষ্টা করেছেন—ব্রিটিশের শাসনব্যবস্থায় স্বরাজের আন্দোলন ভারতের রাজনৈতিক বিকাশকে ব্যাহত করেছে। এমতাবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলো কোনো ইতিবাচক বা জনকল্যাণমূলক কাজ করতে পারেনি। ব্রিটিশ শাসনে রাজনীতি ইংরেজি জানা লোকদের কাছে কুক্ষিগত হয়ে যাওয়ার ফলে জনগণের অংশগ্রহণ সম্ভব হয়নি। ভারতের সামাজিক পরিবেশের কারণেই মুসলিম লীগের জন্ম, যার পেছনে সাম্প্রদায়িকতার চেয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবহেলাই দায়ী। কংগ্রেস মুসলমানদের এই বঞ্চনাকে অনুধাবন না করে একটি সাম্প্রদায়িক দলে পরিণত হয়।[৭] রাজ্জাকের এই আলোচনার মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চিন্তার প্রভাব আছে, যা লাস্কির সাহচর্য থেকে পাওয়া বলেই মনে হয়।

বিলাত থেকে খালি হাতে ফিরে আসলেও লাস্কি থেকে পাওয়া তার এই নবলব্ধ জ্ঞান দিয়ে তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারণাকে বিকশিত করেন। এ দেশে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারণা প্রথমে নিয়ে আসে কমিউনিস্টরা। এদের সুরেই রাজ্জাক সুর মেলান। সরদার ফজলুল করিম, বদরুদ্দীন উমরের মতো পাড় কমিউনিস্টরা যে তার শিষ্যত্ব বরণ করেছিল, এর তাৎপর্য এখানেই লুকিয়ে আছে। এভাবে রাজ্জাক জিন্নাহপন্থি থেকে নেহরুপন্থি হয়ে যান এবং নিজের লেখা ইতিহাসকে নিজেই মুছে ফেলতে তৎপর হন।

আহমদ ছফা অনেক কসরত করে রাজ্জাককে মুসলিম লীগ পন্থি হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। সত্য তিনি মুসলিম লীগের সন্তান, কিন্তু এমন সন্তান যে তার জনকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। এ বিদ্রোহ অনেকটা নিজের ইতিহাস ও পরিচয়ের বিরুদ্ধেও।

০২

আহমদ ছফার মানস কাঠামোটি তৈরি হয়েছিল ১৯৬০-এর দশকে। ছফা যেই প্রজন্মের প্রতিনিধি, সেই ষাটের দশকে এ দেশে বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণার উত্থান ঘটে। বাংলাদেশ আন্দোলনের পটভূমিতে এক বিশেষ ধরনের বাঙালি পরিচয় তখন নির্মিত হয়। এই পরিচয় যারা নির্মাণ করেছিলেন, তারা উনিশ শতকে কলকাতার বর্ণহিন্দুদের তৈরি বাঙালি পরিচয়ের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করেছিলেন। অথচ এই পরিচয় নির্মাণে বাংলাদেশ আন্দোলনের সাথে জড়িত যে মূল জনগোষ্ঠী—বাঙালি মুসলমান, তার ঐতিহাসিক আত্মপরিচয় ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক বাস্তবতাকে আদৌ গণ্য করা হয়নি। উনিশ শতকে কলকাতার বর্ণহিন্দুরা যে সংস্কৃতি তৈরি করেছিল, সেটা ছিল তাদের ওয়ার্ল্ড অর্ডার, মোরাল কোড ও দৈনন্দিন লাইফ স্টাইলের বাই প্রোডাক্ট। অথচ এই ভিন্ন জাতের সংস্কৃতি দিয়ে একটা মুসলমান প্রধান সমাজকে যখন পরিচিত করার চেষ্টা করানো হলো, তখন থেকেই সংকটটা পাকিয়ে উঠল এবং বাংলাদেশের মানুষের স্বাতন্ত্র্য চিন্তাটা দারুণভাবে বিঘ্নিত হলো। আজকে আমাদের দেশে জাতি পরিচয়গত যে সংকট, তার শুরু এখান থেকেই।

কলকাতায় তৈরি যে বাঙালি পরিচয়, সেটা ঐতিহাসিকভাবেই ছিল সাম্প্রদায়িক। কারণ, এটা বাঙালির বড়ো শরিক মুসলমানদের কোনো জায়গা দেয়নি। ফলে ঐতিহাসিক কারণে এই বাঙালি পরিচয় ষাটের দশকে বাঙালি মুসলমানের একসময়ের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ফসল পাকিস্তানকেই প্রতিপক্ষ বানায় এবং পাকিস্তানের সাথে সংশ্লিষ্ট ইসলাম মুসলমান পরিচয়কে ছুড়ে ফেলতে উদ্যত হয়। এই পরিস্থিতির মধ্যেই ছফা তার যৌবন কাটিয়েছেন এবং পাকিস্তানি চিন্তার বাইরে এসে সেকুলার বাঙালি জাতীয়তাবাদী হিসেবে নিজেকে শনাক্ত করেছেন। একই সাথে ছফার ভাবজগতে দোলা দিয়েছিল ইউরোপীয় রেনেসাঁর বোধ, কলকাতার রেনেসাঁর আবেগ আর সমাজতন্ত্রের ইউটোপিয়া। সেই হিসেবে তরুণ ছফার বুদ্ধিজীবিতাকে আমরা সেকুলার বাঙালি জাতীয়তাবাদী, রেনেসাঁপন্থি ও সমাজতন্ত্রঘেঁষা হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। এর অতিরিক্ত হিসেবে ধর্মের ব্যাপারে তাকে যথেষ্ট সহানুভূতিহীন মনে হয়, অন্তত তার বিস্তর লেখালেখি এর বড়ো প্রমাণ।

ছফার প্রজন্ম পাকিস্তান আন্দোলনের বাস্তবতাকে স্বীকার করেনি। প্রচলিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বয়ানের মতোই তার ভাবনাচিন্তা আটকে ছিল। পাকিস্তান সম্পর্কে তার মত ছিল—

> 'দুনিয়ার বুকে পাকিস্তান একটা বিসংগত রাষ্ট্র—এই রাষ্ট্রের সরকারি দর্শনও বিসংগত। ইসলাম, মুসলিম জাতীয়তা, ইসলামি রাষ্ট্র—এসব গালভরা মনোহর মিথ্যে বুলিই ছিল পাকিস্তানবাদী বুদ্ধিজীবীদের অত্যন্ত আদরের জিনিস।

অথবা

> উনিশশ সাতচল্লিশের দেশ বিভাগ একটা প্রকাণ্ড রাজনৈতিক ভ্রান্তি।

কিংবা

> পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানকে উপনিবেশ হিসেবে ব্যবহার করে আসছিল।'[৮]

ছফার লেখার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল গতিশীলতা, যা পাঠককে আকর্ষণ করে। কিন্তু একটা লেখাকে শক্তিশালী হতে হলে যুক্তি ও তথ্যনির্ভরতা খুবই প্রয়োজন, অনেক ক্ষেত্রে ছফা যার ধার ধারেননি; বরং সেখানে আবেগ এসে বেশি পরিমাণে জড়ো হয়েছে। এর ওপরে অভিযোগ করার একটা আবেগ তাকে গ্রাস করেছিল। এটা তার লেখার ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায়। ছফার পাকিস্তানবিষয়ক ভাবনা যতটা না যৌক্তিক, তার চেয়ে বেশি আবেগনির্ভর।

যাইহোক, ছফার ভাষায় পাকিস্তানের মতো মধ্যযুগীয় ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্র যা কি না পূর্ব বাংলার মানুষের ওপর ঔপনিবেশিক শাসন চাপিয়ে দিয়েছিল, তার থেকে মুক্তির জন্য তিনি ১৯৭১ সালে কলকাতায় চলে যান এবং বাংলাদেশের পক্ষে লড়াইয়ে নেমে পড়েন। তিনি বাংলাদেশ আন্দোলনকে শুধু পাকিস্তানের থেকে মুক্তি হিসেবে বিবেচনা করেননি, তিনি এর ভেতর দিয়ে বাংলাদেশের সমাজের ভেতরে একটা রূপান্তর চেয়েছিলেন, যার পরিণতিতে এখানে রেনেসাঁ আসবে এবং ইউরোপীয় কেতায় ধর্মের সংস্কারমুক্ত একটা যুক্তিশীল মানবিক সমাজ গড়ে উঠবে। এসব চিন্তার মধ্যে বিপ্লবের ফুলকি আছে, কিন্তু সমাজ বাস্তবতার দিক দিয়ে এটা কতটা যৌক্তিক ছিল সেটা পর্যালোচনা করাই যেতে পারে। ছফার বাংলাদেশ আন্দোলনে যোগদানের সাথে অন্যদের যোগদানের এটা একটা মৌলিক তফাত বলা যেতে পারে।

ছফার মধ্যে একধরনের আপসহীনতা ছিল। এই আপসহীনতা যেমন তার ভেতরে একটা আশাবাদ তৈরি করেছিল, তেমনি পরবর্তীকালে এটা তার বিশাল মোহভঙ্গের কারণ হয়। ৭১ তার জীবনের একটা টার্নিং পয়েন্ট। তিনি মনে করতেন, ৭১'র ঘটনার ভেতর দিয়ে বাঙালি জাতি প্রথমবারের মতো ইতিহাসে একটি রাষ্ট্রের জন্ম দেয়।[৯]

এটা ছিল ঘটনার একটা দিক। ঘটনার অন্য দিকটা হলো—৭১'র যুদ্ধ চলাকালে এবং ৭১-উত্তরকালে যে মধ্যশ্রেণি বাংলাদেশে তৈরির নেতৃত্ব দেয় তাদের গণবিরোধী চেহারা তাকে বিস্মিত করে। এই দুর্নীতিগ্রস্ত মধ্যশ্রেণির নির্বিচার সুবিধাবাদিতা যে নতুন বাংলাদেশের সমাজ পরিবর্তনে কোনো মৌলিক পরিবর্তন আনবে না, এটা তিনি বুঝতে পারেন। তিনি লিখেছেন—

> 'সন্ত্রাস, গুম, খুন, ছিনতাই, দস্যুতা, মুনাফাখোরি, কালোবাজারি, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নির্বিচার হত্যা—এগুলো একান্তই নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মানুষের হনন প্রবৃত্তি, লোভ রিরংসার এ রকম নির্লজ্জ আত্মপ্রকাশের সিংহদুয়ার খুলে দেওয়ার ব্যাপারে তৎকালীন সরকার মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল।'[১০]

এইভাবে বাংলাদেশের ওপর যথেষ্ট আনুগত্য ও অনুরাগ রেখেই এবং আদর্শগতভাবে খুব নিকটবর্তী থাকা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ থেকে তিনি দূরে চলে যান। আওয়ামী লীগ দিয়ে দেশের যে কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন হবে না, এটা নিশ্চিত বুঝতে পেরে তিনি ৭১-উত্তরকালে জাসদের দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং এই দলটির মুখপত্র *গণকণ্ঠ* পত্রিকার সাথে যুক্ত হন। এই পত্রিকায় তার সহযাত্রী ছিলেন আল মাহমুদ ও আফতাব আহমদ। কী কারণে জাসদকে ছফার একটি বিপ্লবী দল মনে হয়েছিল এবং এর ভেতর দিয়ে তিনি কেন নতুন করে স্বপ্ন দেখা শুরু করলেন সেটা ব্যাখ্যা করা একটা কঠিন কাজ বৈকি। জাসদ তো আওয়ামী লীগের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা একদল উত্তেজিত তরুণদের দ্বারা গঠিত দল, যারা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কথা বললেও এর কোনো সুচিন্তিত রাজনৈতিক দর্শন ছিল বলে মনে হয় না।

আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে শুধু প্রবল ক্ষোভ ও সহিংসতার রাজনীতি দিয়ে বিপ্লবী কোনো পরিবর্তন সম্ভব ছিল কি না, সেটাও একটা তীব্র পর্যালোচনার বিষয়। তাই ৭৫ সালে শেখ মুজিবের ইন্তেকালের পর এই দলটিও ছত্রখান হয়ে যায় বলা চলে। এইভাবে জাসদের অপমৃত্যুর ভেতর দিয়ে ছফার

দ্বিতীয়বারের মতো মোহভঙ্গ হয়। এইভাবে আমরা দেখব, ছফার বুদ্ধিবৃত্তিক পরিব্রাজন এক মোহভঙ্গ থেকে আরেক মোহভঙ্গের তীরে আছড়ে পড়ছে।

৭৫ সালের ১৫ আগস্টের ঘটনা কি ছফার জন্য আরেকটা টার্নিং পয়েন্ট? তিনি ৭১-উত্তরকালে আওয়ামী লীগের সমালোচনা করেছিলেন এটা যেমন সত্য, তেমনি তিনি এও মনে করতেন যে, এই দলটিই বাঙালিদের জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে। এর ভেতর দিয়ে বাঙালির মুক্তি ঘটবে, চিন্তার উত্থান ঘটবে, যুক্তিশীলতার চাষবাস হবে—এটাও তার একসময়ের স্বপ্ন ছিল। এই নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়ে তিনি আশা করেছিলেন—

> 'কামাল পাশার তুরস্কের মতো বাংলাদেশেও অনেকগুলো মজ্জাগত ধর্মীয় সংস্কার জোর করে পিটিয়ে তাড়াতে হবে।'[১১]

আওয়ামী লীগের সাথে তার ছিল একই সাথে প্রেম ও ঘৃণার সম্পর্ক। এ দলটিকে তিনি ছাড়তেও পারেননি, হজমও করতে পারেননি। এই কারণেই আওয়ামী লীগ সম্পর্কে পরবর্তী সময়ে তার মূল্যায়ন ছিল—

> 'মূলত আওয়ামী লীগই একমাত্র দল, যারা আমাদের জনগণের ঐতিহাসিক সংগ্রামের উত্তাপ থেকে জন্ম নিয়েছে এবং তাই তার একটি ঐতিহাসিক ভিত্তি রয়েছে। মুশকিলের কথা হলো আওয়ামী লীগ যখন জিতে, তখন মুষ্টিমেয় নেতা বা নেত্রীর বিজয় সূচিত হয়। কিন্তু আওয়ামী লীগ যখন পরাজিত হয়, গোটা বাংলাদেশটাই পরাজিত হয়।'[১২]

৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর তাই যখন আওয়ামী লীগের প্রধান পুরুষ দৃশ্যপট থেকে অপসৃত হন, স্বাভাবিকভাবেই তিনি বেদনাহত হয়েছিলেন। বিশেষ করে ১৫ আগস্টের পর বাংলাদেশের সমাজ-রাজনীতি-সংস্কৃতিতে যখন ইসলামের দুরন্ত গতিতে প্রত্যাবর্তন ঘটল, ইসলাম যখন প্রান্ত থেকে কেন্দ্র এসে জায়গা নিল, তখন তার হাহাকার হতাশায় পরিণত হলো। তিনি লিখেছেন—

> 'মৌলবাদ অক্টোপাসের মতো ক্রমাগতভাবে আমাদের সমাজকে চারপাশ থেকে বেষ্টন করে ফেলছে।'[১৩]

৭৫-উত্তরকালে ছফার এই হতাশাগ্রস্ত মনের বিস্ফোরণ ঘটল তার 'বাঙালি মুসলমানের মন' নামক লেখায়। এ লেখার পটভূমি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—

'আমি আবুল ফজল সাহেবকে টুপি পরে সিরাত মাহফিলে যোগ দিতে যাওয়ার ঘোষণা শুনে মনে মনে একটা চোট পেয়ে গেলাম। এই ঘোষিতভাবে নাস্তিক ভদ্রলোকটি আজকে ক্ষমতার স্বাদ পেতে না পেতে নিজেকে প্রচণ্ড ধার্মিক বলে পরিচয় দিতে চাইছেন। এরকম কাণ্ড কি করে ঘটে সেটা আমাকে ভয়ানক রকম চিন্তিত ও উতলা করে তোলে।...

এই যে হঠাৎ পরিচয় পালটে ফেলা, তার পেছনে আমার মনে হয়েছিল একগুচ্ছ সামাজিক কারণ বর্তমান। আবুল ফজল সাহেব উপলক্ষ্য মাত্র কারণ নন। বাঙালি মুসলমান সমাজের ভেতরে এমন কিছু ব্যাপার-স্যাপার আছে যেগুলো ব্যক্তিকে কোনো বিশ্বাসের বিন্দুতে স্থির থাকতে দেয় না। ডানে কিংবা বাঁয়ে হেলতে বাধ্য করে। মনের এই উত্তেজিত অবস্থাতে আমি একরাতে একটুও না থেমে বাঙালি মুসলমান রচনাটি লিখে শেষ করি।'[১৪]

বোঝাই যাচ্ছে, এ লেখায় এক উত্তেজিত তরুণের হাহাকার শোনা যায়। মনের সেই ভগ্ন অবস্থায় তিনি বাঙালি মুসলমান সমাজকে ইচ্ছেমতো গাল পাড়েন। যেকোনো পড়ুয়া পাঠকই স্বীকার করবেন—ছফা যখন এ প্রবন্ধ লেখেন, তখন তার নির্মোহ বিচারের ক্ষমতা পুরোটাই লুপ্ত হয়েছিল। সমাজ গবেষণার কোনো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ছাড়াই তিনি এ প্রবন্ধে কিছু আবেগী মতামত উদ্‌গিরণ করেছেন মাত্র। ছফার কাছে বাঙালি মুসলমানকে মনে হয়েছে চিন্তাগতভাবে অপরিচিত, তাই পরনির্ভরশীল। সে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে অক্ষম, ফলে প্রতিক্রিয়াশীল। সে নতুন চিন্তা গ্রহণে অপটু বলেই অতীতাশ্রয়ী। সে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুবিধাভোগী, কিন্তু এতে তার কোনো অবদান নেই। সে হিন্দুবিদ্বেষী, সে অনড়-অচল।

বাঙালি মুসলমান নিয়ে ছফার এই তথ্য ও প্রমাণবিহীন বক্তব্যের সূত্রটা কোথায়? এই বক্তব্যের সাথে মিল দেখা যায় কলকাতাকেন্দ্রিক বাঙালিত্বের সাধক আনিসুজ্জামানের লেখা *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*-র যুক্তি পরম্পরার। ছফার সাথে আনিসুজ্জামানের প্রীতির সম্পর্ক ছিল। ছফা তার বইতে দাবি করেছেন, তার শিক্ষক আনিসুজ্জামানকে দিয়ে তিনি পাকিস্তান আমলে রবীন্দ্র রাজনীতির রমরমার কালে রবীন্দ্রনাথের ওপর একটি বই সম্পাদনা করিয়েছিলেন। সেখানে তার নিজেরও একটি লেখা আছে। আনিসুজ্জামানের প্রভাব কি তার ওপর কিছুটা পড়েছিল? কেননা, এদের দুজনের বয়ানের অভিমুখ কিন্তু একই বলা চলে। আনিসুজ্জামান তার

বইতে বাঙালি মুসলমানদের চরিত্রকে এভাবে চিহ্নিত করেছেন—'মুসলমান সাহিত্যিকরা হিন্দুদের তুলনায় ইতিহাসবিমুখ এবং সমাজ পরিবর্তনের বিরোধী। মুসলমান সাহিত্যিকরা হিন্দুদের মতো আধুনিকতার আলোর স্পর্শে আলোকিত হতে চায়নি এবং মুসলমান সাহিত্যিকরা হিন্দুবিদ্বেষী।'

আনিসুজ্জামানের এসব কথার সাথে আবার মিল দেখা যায় উনিশশ ত্রিশের দশকে ঢাকার শিখা আন্দোলনের ভাবুকদের। এরাও বাঙালি মুসলমানকে হীনম্মন্য, পশ্চাৎপদ, অক্ষম হিসেবে দেখিয়েছেন। বিশেষ করে কাজী আবদুল ওদুদ ও আবুল হুসেনের লেখায় এর এন্তার নমুনা রয়েছে। শিখা আন্দোলনের ভাবুকরা ছিলেন কলকাতার রেনেসাঁর অনুরাগী। রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ ছিল এদের মেন্টর। ওদুদ থেকে ছফা—এটা একটা সাংস্কৃতিক লিনিয়েজ বা সিলসিলা, যারা শুধু বাঙালি মুসলমানকে গাল দিয়েছেন, কিন্তু ভালোবেসে কাছে টানতে পারেননি।

কলকাতায় উৎপাদিত বাঙালিত্বের এই বয়ান বাঙালি মুসলমান সমাজকে অপর বানিয়েছে। দুঃখজনকভাবে সত্য, এই অপরায়নের বয়ান ওদুদ থেকে ছফা সবাই ধার করেছেন। ছফার বাঙালি মুসলমানের মন লেখাটি কলকাতার হিন্দুত্ববাদী বয়ানের সম্প্রসারণ যেটি হিন্দুত্ববাদী লেখকদের হাতে তৈরি হয়েছিল। অথচ বাঙালি মুসলমানের একটা ঐতিহাসিক আত্মপরিচয় আছে। তার নায়ক আছে, সৃষ্টি আছে। ছফার বয়ান সেই পরিচয়কে ঢেকে দিয়ে হাজার বছরের বাঙালি মার্কা গোঁজামিলের বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রত্যয়ন করে এবং যাবতীয় ইসলাম পরিচয়কে পরিত্যাজ্য করতে শেখায়। বাংলাদেশের একশ্রেণির পাঠকদের মধ্যে ছফার এই লেখাটির রমরমা গ্রহণযোগ্যতার পশ্চাতে একটিই কারণ, এটি আমাদের কলকাতার বয়ানের স্বেচ্ছুক অংশীদার করে তোলে।

০৩

আহমদ ছফার সাথে আনিসুজ্জামানের মিল যেমন আছে, তেমনি অমিলের জায়গাটাও আছে। এই অমিলটাই ছফাকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। ছফার বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনে বারবার মোহভঙ্গ হয়েছে। তিনি বারবার প্রোমিজড ল্যান্ডের স্বপ্ন দেখেছেন, কিন্তু সেই স্বপ্ন অধরাই রয়ে গেছে। কিন্তু মনের চরম ভগ্ন অবস্থায়ও তিনি হাল ছেড়ে দেননি; বরং পুরনো ব্যর্থতার ধুলোকালিকে পর্যালোচনা করতে চেয়েছেন এবং যথাসময়ে তা সাফসুতরো করতেও চেয়েছেন কিছুটা।

হতাশাগ্রস্ত মনও একসময় ঘুরে দাঁড়ায়, সময়ের দিকে চোখ ফেরায়। ছফার ক্ষেত্রেও এ ঘটনাটা ঘটেছিল। আনিসুজ্জামানের ভেতরে যেমন একটা অসংগত কলকাতা মুগ্ধতা ছিল এবং এটার কোনো বিচার পর্যালোচনা করতে তিনি রাজি ছিলেন না; বরং এটাকে তিনি প্রশ্নাতীত বানিয়ে ফেলেছিলেন, ছফার ক্ষেত্রে সেটা পুরোপুরি ঘটেনি। এটা সত্য যে, ছফা কলকাতার রেনেসাঁর অনুরাগী ছিলেন, এর সৃজনশীলতার মুগ্ধ উপভোগকারী ছিলেন; কিন্তু ঘুরে দাঁড়ানোর কালে ছফা তার কলকাতা মুগ্ধতা বাদ দিয়ে কলকাতার সাংস্কৃতিক সীমাবদ্ধতাকে পর্যালোচনা শুরু করেন। তিনি একটু একটু করে বুঝতে পারেন; এতদিন আমরা যতই বাঙালি বাঙালি বলে চিৎকার করি না কেন, বাঙালির জগৎ আসলে একটা নয়, দুটো।

কলকাতার সংস্কৃতি যতই বর্ণাঢ্য হোক না কেন, এর একটা অন্ধকার দিকও আছে। সাংস্কৃতিক চরিত্রের দিক দিয়ে এটি বর্ণবাদী ও সাম্প্রদায়িক। কলকাতার এই অন্ধকার দিকটি নিয়ে ছফা প্রশ্ন করতে শুরু করেন—যা আনিসুজ্জামানরা বাঙালিত্বের ছত্রছায়ায় ঢেকে দিতে চেয়েছিলেন। ছফার এই নতুন উপলব্ধির স্বাক্ষর আমরা দেখতে পাই তার *শতবর্ষের ফেরারী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়* বইয়ে। এ বইয়ে তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন—

> 'বাংলাদেশ বিভাগ করার জন্য কোনো একজন ব্যক্তিকে দায়ী করতে হয়, তিনি অবশ্যই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।'[১৫]

তিনি আরও বললেন; আজকে ভারতজুড়ে যে হিন্দু রাষ্ট্রের স্বপ্ন, সাম্প্রদায়িকতার রমরমা তার মূলেও বঙ্কিম। মুসলিম জাতীয়তাবাদপন্থি কবি, লেখক, বুদ্ধিজীবীরা এসব কথা অনেকবার বলেছেন, এ কথা সত্য। কিন্তু এ দেশের প্রগতিশীল লেখককুলের মধ্যে ছফাই প্রথম, যিনি এ রকম

কথা এত শক্তভাবে বলতে পেরেছেন। এ বইতে তিনি কলকাতাকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা থেকে সরে আসার ইঙ্গিত দেন এবং বাংলাদেশের মুসলমানপ্রধান সমাজের জন্য বাঙালিয়ানা ও সেকুলারিজমের একটি নতুন সংজ্ঞা তৈরির প্রস্তাব দেন। ধর্মতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম আগের মতোই চলমান রাখেন বটে, তবে এবার তিনি কলকাতার প্রভাবমুক্ত বাংলাদেশের এক বিশেষ চরিত্রের সেকুলারিজমের ওপর জোর দেন। এভাবে কলকাতাকেন্দ্রিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী থেকে ছফা বাংলাদেশকেন্দ্রিক সেকুলার বাঙালি জাতীয়তাবাদীতে পরিণত হন। সম্ভবত ছফার এ পথরেখা ধরেই আমাদের এখানকার বামপন্থি লেখক ফরহাদ মজহার, সলিমুল্লাহ খান ও মোহাম্মদ আজমরা অগ্রসর হচ্ছেন।

ছফা কলকাতার সাথে একটা সাংস্কৃতিক লড়াইয়ে নেমেছিলেন। তার মনে হয়েছিল, কলকাতার প্রভাবমুক্তি না ঘটলে বাংলাদেশ তার স্বাতন্ত্র্য নিয়ে দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু এ লড়াইয়ে তিনি একাকী। *শতবর্ষের ফেরারী*-র মতো বই লিখে এখানে টিকে থাকা যাবে না। এটা বিলক্ষণ বুঝতে পেরে বাংলাদেশের জন্য নিজের সাথে এমন একজন আইকন খুঁজে নিলেন, যার একটা লিবারেল পরিচিতি আছে, অথচ তিনি বললে কথাটার গ্রহণযোগ্যতা বেশি হবে। ইনি হলেন আবদুর রাজ্জাক।

ছফার *যদ্যপি আমার গুরু* বইয়ে আদতে আবদুর রাজ্জাকের এ রকম একটি পরিচয়ই আমরা দেখি, যেটা বাংলাদেশের স্বতন্ত্র চরিত্রের জন্য তিনি নির্মাণ করেছিলেন। এ বইতে ভারত রাষ্ট্র, গান্ধী, কংগ্রেস, বেঙ্গল রেনেসাঁ বা কলকাতার ভদ্রলোক সমাজকে এতকাল যে সেকুলার বলা হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। ভারত রাষ্ট্রের ভিত্তিটা যে হিন্দুত্ব, এর বাইরে রাষ্ট্র গঠনের অন্য কোনো ভিত্তি যে নেই, কংগ্রেস যে একটা কেন্দ্রীয় হিন্দু রাষ্ট্রই চেয়েছিল, ভারত বিভাগের ক্ষেত্রে জিন্নাহর একটা ভূমিকা থাকলেও তার যে কোনো দায় নেই বরং শেষ মুহূর্তে ব্রিটিশের প্রস্তাবিত ফেডারেশন জিন্নাহর সমর্থন সত্ত্বেও কংগ্রেসের বিরোধিতায় চুলোয় যায়—এসব কথা আবদুর রাজ্জাকের বরাতে সাজিয়ে-গুছিয়ে ছফা জরুরি ইশতেহার হিসেবে হাজির করেছেন। এসব কথা চল্লিশের দশকে আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন প্রমুখ বাঙালি মুসলমান পণ্ডিতরা খুব জোরের সাথে আলাপ করেছিলেন। তখন এসব কথাবার্তাকে কলকাতার সারস্বত সমাজ সাম্প্রদায়িক, বিচ্ছিন্নতাবাদী ইত্যাদি বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। ছফার ট্রাজেডি হলো কয়েক দশক পরে কলকাতার সাথে

সাংস্কৃতিক লড়াইয়ে নেমে সেই সব যুক্তিকে ফিরিয়ে আনতে হলো, যা কি না বাঙালি জাতীয়তাবাদের ঘোরে পড়ে একদিন তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এভাবেই ছফার সাংস্কৃতিক জার্নি শেষ হলো। তিনি কলকাতাকেন্দ্রিক সেকুলার বাঙালি জাতীয়তাবাদী থেকে ঢাকাকেন্দ্রিক সেকুলার বাঙালি জাতীয়তাবাদী হিসেবে হাজির হলেন। বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে তিনি এর বেশি অগ্রসর হতে পারেননি।

এখন প্রশ্ন হলো—ছফা *যদ্যপি আমার গুরু*তে যে বয়ান হাজির করেছেন, তার কতটুকু নিজের আর কতটুকু রাজ্জাকের? এর মীমাংসা আজ আর সম্ভব নয়, হয়তো কতগুলো প্রশ্ন তোলা যায়। জীবনের শেষের দিকে রাজ্জাক তো বদলে গিয়েছিলেন। ভাষা আন্দোলনের পরবর্তীকালে তার মানস গঠনের মধ্যে পরিবর্তন এসেছিল। তাকে বাংলাদেশে আন্দোলনের প্রধান সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যাতা হিসেবে ধরা হয়। ছফা যে রাজ্জাককে হাজির করেছেন, তাতে কি মনে করার সংগত কারণ আছে তার মানস পরিবর্তন বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে পুরোপুরি সম্পূর্ণ হয়েছিল? কারণ, তার বয়ানে মুসলিম জাতীয়তাবাদের একটা রেশ আমরা দেখি। এসব থেকে মনে হয়, রাজ্জাকের মধ্যেও একটা দোদুল্যমানতা ছিল। আবার সেই দোদুল্যমানতার প্রভাব ছফার ওপর আবশ্যিকভাবে পড়েছিল। তার মানসজগতেও ভাবান্তর চলছিল। এই কারণেই তিনি মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভাবনাগুলোকে কলকাতার সাথে লড়াইয়ে ব্যবহার করেছেন। যাইহোক, ছফার বই *যদ্যপি আমার গুরু*-কে কলকাতাকেন্দ্রিক বয়ানের বাইরে এক সাংস্কৃতিক জওয়াব হিসেবে শনাক্ত করা যেতে পারে।

এবার আমরা ছফার ইসলাম প্রশ্নে অবস্থানকে একটু পর্যালোচনা করব। আমরা জানি তার ওপর আহমদ শরীফ, বদরুদ্দীন উমরদের প্রভাব ছিল। এদের প্রভাবে নাস্তিকতার একটা বাতাস তার ওপরে হয়তো পড়েছিল। হয়তো এসব কারণে ইসলাম প্রশ্নে তিনি কোনো সুস্পষ্ট ভূমিকা রাখতে পারেননি। অথবা বাঙালি মুসলমানদের আত্মপরিচয় নির্মাণে ইসলামের যে ভূমিকা আছে, এটাও তিনি মানতে পারেননি। একটি মুসলিমপ্রধান সমাজে জন্মগ্রহণ করে ইসলাম সম্পর্কে এতখানি উদাসীন থাকা একজন বুদ্ধিজীবী হিসেবে তার একটা সীমাবদ্ধতাই বলা যেতে পারে। তিনি শেষ পর্যন্ত সেকুলার, ইউরোপীয় রেনেসাঁ ও সমাজতন্ত্রমনা পণ্ডিত হিসেবেই কাটিয়ে গেছেন। জীবদ্দশায় তিনি দেখেছেন, সহযাত্রী আল মাহমুদ তার স্বদেশে ফিরে গেছেন, ইসলামের মধ্যে মানবমুক্তির সন্ধান করেছেন। তার আরেক

সহযাত্রী আফতাব আহমদ মুসলিমঘেঁষা বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ফিরতে পারেননি। ইতিহাসে সবার পক্ষে একই ভূমিকা রাখা সম্ভব নয়। ছফাও পারেননি। নিয়তি বলে তো একটা কথা আছে।

হদিস :

১. সরদার ফজলুল করিম, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ববঙ্গীয় সমাজ অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক-এর আলাপচারিতা*। ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ : ১৯৯৩

২. আহমদ ছফা, *যদ্যপি আমার গুরু*। ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৭

৩. প্রাগুক্ত।

৪. Syed Sajjad Hussain, *The Wastes of Time*. Dhaka : Notun Safar Prokashoni, 1995.

৫. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, *একাত্তরের স্মৃতি*। ঢাকা : নতুন সফর প্রকাশনী, ১৯৯৩

৬. Syed Sajjad Husain, *The Wastes of Time*.

৭. Abdur Razzaq, *Political Parties in India*. Dhaka : The University Press Limited, 2022.

৮. আহমদ ছফা, *বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস*। ঢাকা : খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ২০২০

৯. প্রাগুক্ত

১০. প্রাগুক্ত।

১১. প্রাগুক্ত।

১২. আহমদ ছফা, *বাঙালি মুসলমানের মন*। ঢাকা : বুক পয়েন্ট, ১৯৯৬

১৩. আহমদ ছফা, *বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস*।

১৪. আহমদ ছফা, *বাঙালি মুসলমানের মন*।

১৫. আহমদ ছফা, *শতবর্ষের ফেরারী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়*। ঢাকা : খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ২০১৮

হুমায়ুন কবির : আমাদের সেকুলার হয়ে ওঠার বিপদ

০১

হুমায়ুন কবিরের মতো প্রতিভা সেকালের মতো একালেও দুর্লভ! তিনি জন্মেছিলেন আমাদের বাংলাদেশের ফরিদপুরে। যেকালে মুসলমান ছেলেরা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা পার হতে পারত না, সেই কালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বর্ণাঢ্য ফলাফল করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, বিলাতের অক্সফোর্ডে এক গৌরবময় সফলতার সাথে তিনি তার ছাত্রজীবন শেষ করেছিলেন।

এমনই নানা গুণে সমন্বিত প্রতিভাধর মানুষটি নিয়ে সেদিনকার নিঃস্ব দীন মুসলমান সমাজ আশায় বুক বেধেছিল এবং তার মধ্যে তাদের সফলতা ও প্রতিনিধিত্বের এক ছায়া দেখতে চেয়েছিল। কিন্তু মুসলমান সমাজের দুর্ভাগ্য, হুমায়ুন কবিরের মেধা তাদের কোনো কাজে আসেনি। রাজনৈতিক বিশ্বাসের কারণে তিনি নিজের সমাজের সাথে একটা অপরিচয়ের দূরত্ব তৈরি করেছিলেন এবং এই বিশ্বাসের কারণেই তিনি শেষ পর্যন্ত মাতৃভূমিকেও নির্বাসন দেন।

অবিভক্ত ভারতে তিনি কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন এবং তার রাজনৈতিক জীবনের বৃহত্তর ও কার্যকরী অংশ কেটেছে কংগ্রেসের রাজনীতিতে। এই রাজনীতি করতে গিয়ে তিনি ভারতের শিক্ষামন্ত্রী হয়েছিলেন। যদিও কংগ্রেস তার মেধা ও অবদানের যথেষ্ট মূল্যায়ন করেনি এবং শেষ জীবনে তাকে একরকম পরিত্যাগ করেছিল বলা চলে। প্রাপ্য বঞ্চিতের বেদনায় তিনি

হয়েছিলেন জর্জরিত। একে নিজের সমাজ ত্যাগ করার একটা বেদনাদায়ক পরিণতিই বলা চলে।

যাই হোক, হুমায়ুনকে নিয়ে আমার এত কথা বলার উদ্দেশ্য ভিন্ন। এখন আমরা সেদিকে যাব। হুমায়ুন শুধু রাজনীতিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন একই সাথে একজন কবি, লেখক ও সাহিত্য সমালোচক। তার একটি বইয়ের নাম হলো *বাংলার কাব্য*। হুমায়ুনের ভাষায় এটি বাংলা কবিতার একটি সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা। ১৯৪০-এর দশকে হুমায়ুনের এ বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়, যখন ভারতে হিন্দু-মুসলমান প্রশ্ন দগদগে ঘায়ের মতো স্ফীত হয়ে উঠেছে। হুমায়ুন কেন এই বইটি লিখেছিলেন? বাংলা কবিতার পটভূমি লিখতে গিয়ে তিনি এখানে দেখাতে চেয়েছেন হিন্দু-মুসলমানের যৌথ সাধনার একটি চেহারা। ইসলামের বিপ্লবী সাম্যবাদ কীভাবে হিন্দু মনকে আলোড়িত করেছিল, আবার হিন্দুর স্পর্শ কীভাবে মুসলমানের চিত্তবৃত্তিকেও সমৃদ্ধ করেছে তার কথা। যারা সেদিন সমন্বয়বাদী জাতীয়তাবাদের কথা বলতেন, তারা শুধু কবিতা নয় ইতিহাস, সংস্কৃতি, রাজনীতি প্রতিটি উৎসমুখকে এভাবে ব্যাখ্যা করার প্রস্তাব করেছিলেন। যদিও ইতিহাস ও সংস্কৃতির গতি এত একহারা নয়। অন্যথায় ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ হতো না। হুমায়ুন সে কথাটা হয়তো রাজনীতির কারণে বলতে চাননি।

এটা অবশ্য সত্য যে, সুকুমার সেনের মতো বাংলা ভাষার পণ্ডিতরা বাংলা সাহিত্য বিচারের জায়গায় মুসলমানদের একেবারেই গণ্য করতে চাননি। রাজনীতির কারণেই হুমায়ুনকে হতে হয়েছিল তুলনামূলকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক। তিনি তার গ্রন্থে মুসলমান সম্প্রদায়কে কাব্য চেতনার মূলধারায় জায়গা দিয়েছেন, যদিও তার স্বাতন্ত্র্যের ধারণাকে তিনি নিরুৎসাহিত করেছেন পুরোদমে। এর কারণ তিনি কংগ্রেসকে একটা সব ধর্মের দল হিসেবে দেখাতে চেয়েছিলেন এবং তার জন্য একটি নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি দরকার ছিল। *বাংলার কাব্য* গ্রন্থে এই নৈতিক ভিত্তি তিনি হাজির করার চেষ্টা করেছেন।

কবিতা শুধু কবিতা নয়, এটা একটা সমাজের সোশ্যাল ও পলিটিক্যাল ডিসকোর্সও বটে। ব্যক্তির ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ সামাজিক পটভূমিতেই হয়ে থাকে। *বাংলার কাব্য* প্রকারান্তরে কংগ্রেসের সাংস্কৃতিক-রাজনীতির বয়ান ছাড়া কিছু নয়। বিস্তর মতান্তরের জায়গা থাকলেও বাঙলার কাব্য কিতাবে হুমায়ুন দু-একটি অন্তর্ভেদী সত্যের আলাপও করেছেন। তার এই পর্যবেক্ষণটি দেখা যাক—

'পশ্চিম বাংলার প্রকৃতি তাই বাঙালির কবি মানসকে যে রূপ দিয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে লোকাতীত রহস্যের আভাস। অনির্ব্বচনীয়ের আস্বাদে অন্তর সেখানে উন্মুখ ও প্রত্যাশী, জীবনের প্রতিদিনের সংগ্রাম ও প্রচেষ্টাকে অতিক্রম করে প্রশান্তির মধ্যে আত্মবিস্মরণ।

বাঙলার পূর্ব্বাঞ্চলের প্রকৃতি ভিন্নধর্মী। পূর্ব্ব বাঙলার নিসর্গ হৃদয়কে ভাবুক করেছে বটে, কিন্তু উদাসী করেনি। দিগন্ত প্রসারিত প্রান্তরের অভাব সেখানেও নাই, কিন্তু সে প্রান্তরে রয়েছে আহোরাত্র জীবনের চঞ্চল লীলা। পদ্মা-যমুনা-মেঘনার অবিরাম স্রোতধারায় নতুন জগতের সৃষ্টি ও পুরাতনের ধ্বংস। প্রকৃতির বিপুল শক্তি নিয়তই উদ্যত হয়ে রয়েছে, কখন আঘাত করবে তার ঠিকানা নেই। কূলে কূলে জল ভরে ওঠে, সোনার ধানে পৃথিবী ঐশ্বর্যময়ী, আর সেই জীবন ও মরণের অনন্ত দোলার মধ্যে সংগ্রামশীল মানুষ। প্রকৃতির সে ঔদার্য্য, সৃষ্টি ও ধ্বংসের সেই সংহত শক্তি ভোলবার অবসর কই? চরের মানুষ নদীর সাথে লড়াই করে, জলের ঐশ্বর্য্যকে লুটে জীবনের উপাদান আনে। তাই লোকাতীতের মহত্ত্ব হৃদয়কে সেখানে স্পর্শ করে, কিন্তু মনের দিগন্তকে প্রসারিত করেই তার পরিসমাপ্তি। প্রশান্তির মধ্যে আত্মবিস্মরণের সেখানে অবকাশ কই?'[১]

পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার মনোগঠনে যে পার্থক্য, তা দুই বাংলার ভৌগোলিক ও নৈসর্গিক স্বাতন্ত্র্যের ভেতর দিয়েই প্রকাশিত হয়েছে। এর ফলাফল হিসেবে আমরা দেখতে পাই—পূর্ব বাংলায় আর্য সভ্যতার আগ্রাসন খুব একটা কার্যকর হয়নি। ফলে ধর্মীয় বিপ্লব আকারে হাজির হলেও এর অন্তরালবর্তী সামাজিক-রাজনৈতিক বিপ্লব হিসেবে বৌদ্ধ ও মুসলিম সংস্কৃতির উত্থান প্রবল আকারে পূর্ব বাংলাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। রাজনৈতিকভাবে সমন্বয়পন্থি হলেও এবং রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশ থেকে বাংলার কাব্য লেখা হলেও হুমায়ুন কবিরের বিশ্লেষণী মন দুই বাংলার এই স্বাতন্ত্র্যকে অস্বীকার করতে চায়নি।

হুমায়ুন কবির প্রায় সমসময়ে আরেকটি প্রবন্ধ লেখেন। এর নাম *বাংলা ভাষা ও মুসলমান সাহিত্য*। এ প্রবন্ধে তিনি মুসলিম মানসের যে একটি স্বতন্ত্র মানচিত্র রয়েছে, তার ব্যাপারে যথেষ্ট সংবেদনশীলতার পরিচয় দেন। যদিও তিনি স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র চাননি। তবে তিনি হয়তো চেয়েছিলেন

মুসলিম চেতনার প্রাখর্যকে নিরুৎসাহিত করে এবং অন্যদিকে তার সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের মৌল প্রকৃতিকে স্বীকার করে একধরনের বাঙালি জাতীয়তার বিকাশ ঘটাতে। কিন্তু কলকাতার সাংস্কৃতিক পুরোহিতরা এই ধরনের ভাবনাকে প্রশ্রয় দেয়নি। তাই ইতিহাসের রায়ও ভিন্ন রকম হয়েছে এবং হুমায়ুনের আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রয়ে গেছে।

যাইহোক, *বাংলার কাব্য* কিতাবে তিনি যেমন দুই বাংলার ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্যের কথা বলেছেন, তেমনি এই প্রবন্ধে দুই বাংলার ভাষিক কতক ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের কথাও বলেছেন। তার উদ্ধৃতি নেওয়া যাক—

> 'বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ও আরবি ফারসি শব্দের ভাগাভাগি নিয়ে মতের অমিল রয়েছে, তার ফলে একই ভাষার দুটি রূপ ফুটে উঠবার সম্ভাবনাও রয়েছে। ঢাকা ফরিদপুরের মুসলমান চাষার কাছে 'কাদম্বরীর' ভাষা একেবারে বিদেশি—এমনকি আধুনিক বাংলার অনেক মাসিক পত্রিকার প্রবন্ধ বোঝাও তার পক্ষে কঠিন। অন্যপক্ষে পুঁথি পড়ে স্কুল-কলেজে পড়া সাধারণ হিন্দুও ত' আনন্দ পাবে না, অনেক জায়গায় অর্থও ঠিক ধরতে পারবে না। উর্দু ও হিন্দির ব্যাপারে ঠিক এই সমস্তই গোড়া থেকে ছিল। লিখবার আলাদা প্রণালি গ্রহণ করায় আজ তারা প্রায় সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলার বেলা যে হয়নি তার একটি কারণ এই যে, একই হরফে হিন্দুয়ানি ও মুসলমানি বাংলা দুইই লেখা হয়।'...
>
> ব্যাবহারিক জীবনেও এ কথার পরিচয় মেলে। যেখানেই ভাষা আলাদা, সেখানেই সামাজিক জীবনের রীতিতে পার্থক্য, আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে বৈচিত্র্য দেখা যায়। বাংলাদেশেও হয়েছে তাই। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভাষার খানিকটা তফাত যে আছে, সে কথা মানতেই হবে। অন্যপক্ষে তাদের আচার-অনুষ্ঠান, সমাজের রীতিনীতির মধ্যেও অমিল অনেক। এর কোনটি কারণ আর কোনটি ফল, সে প্রশ্ন তোলার এখন কোনো দরকার নেই। তবে এ কথা বলা চলে যে, ভাষার আচার-অনুষ্ঠানে রীতিনীতিতে পার্থক্য আছে বলে বিশেষভাবে হিন্দু বা মুসলমান—সাহিত্য রচনারও খানিকটা সম্ভাবনা রয়েছে।[২]

হুমায়ুনের এ আলোচনা ও যুক্তির মধ্যে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের একটা স্বতন্ত্র সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। হুমায়ুন অবশ্য ধর্মের পার্থক্যের কথাটা বলেননি, যেটি দুই বাংলার ভেতরে আর একটা বেড়া হয়ে আছে।

ভূগোল, ভাষা ও ধর্ম—এই তিনে মিলে বাংলাদেশের স্বতন্ত্র পরিচয়কে মূর্ত করে তুলেছে এবং ইতিহাসের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশের উদ্ভবকে এগিয়ে নিয়ে এসেছে। কেন পশ্চিম বাংলা হিন্দু পরিচয় নিয়ে ভারতীয় ফেডারেশনের সাগরে নিমজ্জিত হলো আর কেন পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের ভেতর দিয়ে শেষমেশ স্বতন্ত্র পরিচয়ে মূর্ত হলো, তার জওয়াব পাওয়া যাবে এই তিনের স্বাতন্ত্রিক অবস্থানের ভেতর।

০২

হুমায়ুন কবিরের লেখা থেকেই এটা বোঝা যায় বাঙালির জগৎ আসলে একটা নয়, দুটো। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার বাঙালিত্বের গড়নও একরকম নয়। হিন্দুর বিশেষ আচার-পদ্ধতি, পৃথিবীকে দেখবার বিশেষ ভঙ্গি এবং অনুরূপ মুসলমানের রীতিনীতি, অনুষ্ঠান, তার বিশেষ মানসচিত্র বাঙালিত্বের ভিন্ন ভিন্ন ছবি এঁকে দিয়েছে। এই বাস্তবতা অস্বীকার করার জো নেই এ কারণে যে, বাঙালিত্বের এত ঢক্কা নিনাদের মধ্যেও কিন্তু দুই বাংলা এক হতে পারেনি।

তাই আমাদের প্রচলিত ইতিহাসে বাংলা-বাঙালি-বাঙালিত্ব বলে যে ধারণা চালু আছে, তা কিন্তু বাস্তবতার মুখোমুখি বাঙালিত্ব নয়। বাঙালির ইতিহাস বলে আমরা যা পড়ি বা সাহিত্য-সংস্কৃতিতে প্রতিফলিত হতে দেখি, তাও কিন্তু পূর্ব বাংলার বাঙালিত্ব নয়। এই জিনিসের জন্ম কলোনিয়াল কলকাতায়। ব্রিটিশের সহযোগিতায় আর্য ভারতের সংস্কৃতির সাথে বিলাতের আধুনিকতার মিশ্রণে কলকাতার ব্রাহ্মণরা নয়া হিন্দু বাঙালি সংস্কৃতির একটি কাঠামো গড়ে তুলেছিল। এই কাঠামো গড়তে গিয়ে সুলতানি বাংলার আদি বাংলা ভাষাকে তারা খতনা করে এক সংস্কৃত বহুল বাংলা ভাষার জন্ম দিয়েছিল এবং এই খতনাকৃত ভাষায় বাঙালি হিন্দুরা তাদের সৃষ্টিশীলতার প্রমাণ দিতে শুরু করল।

কলকাতার মানদণ্ডে এই যে নতুন বাঙালিত্ব তৈরি হলো, এর সাথে রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিকভাবে পশ্চাৎপদ বাঙালি মুসলমানদের মোকাবিলা করতে হয়েছিল। কারণ, কলকাতার মানদণ্ডে সংজ্ঞায়িত ওই বাঙালিত্ব তখন বাঙালি মুসলমানের ওপরে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। বহুদিন ধরে কলকাতার সংস্কৃতিসেবীরা এই মিথ্যাটা প্রচার করে বেড়িয়েছেন—বাংলা ভাষা প্রেম মুসলমানদের নেই, এটি কেবল হিন্দুদের এজমালি সম্পত্তি। মুসলমানদের বিরাগের কারণ ছিল, ওই বাংলার ভেতরে তারা তাদের চেহারা দেখতে পায়নি। আর হিন্দুরাও যে বাংলা প্রেমে গদগদ হয়ে পড়েছিল তার কারণ হলো, ওই ভাষাকে তারা সংস্কৃত বহুল ভাষা বানিয়ে নিজেদের সংস্কৃতির উপযোগী করে নিয়েছিল। এটা বাংলা প্রেম নয়, প্রকারান্তরে ধর্মীয় ভাষা সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ মাত্র। উনিশ শতকের বাংলা ও বাঙালিত্ব তাই শুধু একটা কলোনিয়াল প্রকল্প নয়, এটা হিন্দুত্ববাদী প্রকল্পও বটে।

ভাষা যখন পালটে গেল, ব্যাবহারিক জীবনের রীতিতে তার প্রভাব পড়ল। হিন্দু ও মুসলমানের সাংস্কৃতিক জীবন পুরোপুরি উলটো পথে হাঁটতে শুরু করল।

মুসলমানরা কলকাতার সংজ্ঞায়িত ওই বাঙালিত্বের অধীনস্থ হতে চাইল না। কেউ যদি কারও অধীনস্থ না হতে চায়, তখন অপর পক্ষ নানা রকম শক্তি (রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক) আরোপ করে বিরুদ্ধপক্ষকে বশে আনতে চায়। উনিশ-বিশ শতকের রাজনীতিতে অগ্রসর হিন্দু জনগোষ্ঠীর সাথে এভাবে অনগ্রসর মুসলমান সমাজকে নিজেদের স্বকীয়তা ধরে রাখার জন্য লড়াই করতে হয়েছিল, যারা ছিল আবার সংখ্যায় অধিক। হিন্দুরা মুসলমানদের এই প্রতিবাদী রূপকে বলল সাম্প্রদায়িকতা। কারণ, তারা বিচ্ছিন্ন হতে চায়, ঐক্যের ডাকে সাড়া দিতে চায় না। কিন্তু ঐক্য তো জোরাজুরির বিষয় নয়। অসমানকে সমান বানিয়ে তবেই ঐক্যের দ্বার প্রস্তুত করতে হয়। অগ্রসর হিন্দু সমাজের এ রকম কোনো মানসিকতা ছিল না।

আমাদের দেশে বাংলা-বাঙালি-বাঙালিত্ব শব্দগুলোর পাশে আরও কতকগুলো পরিচিত শব্দ আছে। সাম্প্রদায়িকতা-অসাম্প্রদায়িকতা, প্রগতি-প্রতিক্রিয়াশীলতা এবং এই সিরিজের শেষে আমরা আরেকটি শব্দ দেখব, যার নাম সেকুলারিজম। এ শব্দগুলোর শাব্দিক অর্থ যাই হোক না কেন, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এর একটি অতিরিক্ত অর্থও আছে এবং এটিকে বিরামহীনভাবে বাঙালি মুসলমানের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তাদেরকে কলঙ্কিত করার জন্য। তার মানে যা বাঙালি তাই অসাম্প্রদায়িক, তাই প্রগতিশীল এবং সেটাই সেকুলার। এই শব্দ বা ভাষার বিশেষ ডিসকোর্স কলোনিয়াল কলকাতায় হিন্দু আধিপত্যে তৈরি হয়েছে এবং হিন্দু জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক কাঠামোর ভেতর দিয়ে বের করে এনে তাকে বাঙালি সংস্কৃতি নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। কলকাতার বয়ানে এই বাঙালি সংস্কৃতি আবার একই সাথে সেকুলার হয়ে ওঠে। শরৎচন্দ্র যে বাঙালি ও মুসলমানের ফুটবল খেলার কথা লিখেছিলেন, তার সাংস্কৃতিক তাৎপর্য তৈরি হয়েছিল এই কলকাতায়। স্বাভাবিকভাবে কলকাতার এই বয়ানে সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল হলো পূর্ব বাংলা ও তার অন্তর্গত বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠী। একই সাথে তারা আবার সেকুলারিজমের বিরুদ্ধপক্ষ।

কলকাতায় উৎপাদিত বাংলা ও বাঙালিত্বের এই ডিসকোর্স একই সাথে ওখানে উৎপাদিত বাঙালির ইতিহাস বলে যা প্রচলিত, তা বাঙালি মুসলমানের জন্য রীতিমতো বর্ণবাদী, অপমানসূচক ও অপ্রতিনিধিত্বমূলক। সময়ের দাবি হচ্ছে, কলকাতায় উৎপাদিত এই বয়ান ও ইতিহাসকে মুছে দিয়ে পূর্ববঙ্গের জন্য বাংলা ও বাঙালিত্বের একটি নতুন সংজ্ঞা তৈরি করা এবং বাঙালির নতুন ইতিহাস প্রণয়ন করা। যে ইতিহাসে বাঙালি মুসলমানের মুখ প্রধান হয়ে উঠবে।

০৬

আজকের বাংলাদেশে যে জাতিপরিচয়ের সংকট, এর শুরুটা ভাষা আন্দোলনের পর থেকে। আট শ বছর হলো মুসলমানরা এ দেশে এসেছে। এই দীর্ঘ সময়ে মুসলমানদের কোনো পরিচয়গত ঝামেলায় পড়তে হয়নি। কারণ, তারা প্রথমত ছিল মুসলমান এবং দ্বিতীয়ত ভৌগোলিক বঙ্গ পরিচয়ে তারা বাঙালি হিসেবে শনাক্ত হতো। কারণ, বাংলার রাজনৈতিক পরিচয়ের সূত্রপাত হয়েছিল সুলতানি আমলে। ভাষিক পরিচয়ে সেদিন তারা পরিচিত হয়নি। যদিও বাংলা ভাষার জন্ম একদিক দিয়ে মুসলিম সুলতানদের হাতেই হয়েছিল। ভাষিক পরিচয়ে যে জাতীয়তাবাদ এবং তার সেকুলার পরিচয়, এর শুরুটাও কলোনিয়াল কলকাতার বাঙালি প্রকল্পের মধ্যে।

ভাষা আন্দোলনের পর থেকে এবং পরবর্তী সময়ে ষাটের দশকের বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশের পটভূমিতে কলোনিয়াল কলকাতায় উৎপাদিত ভাব-ভাষার পুনর্জন্ম হয়। পূর্ব বাংলার উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণি কলকাতার সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং এই নব্য বাঙালি জাতীয়তাবাদের সাংস্কৃতিক ভিত্তি হিসেবে কলকাতাকে শনাক্ত করে। এইভাবে পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদকে কলকাতার চোখ দিয়ে দেখার ফলে এখানকার জনগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক আত্মপরিচয় ও স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নটা সংশয়ের মধ্যে পড়ে যায়। শুধু তাই নয়, তার ভাষিক স্বাতন্ত্র্যের চেহারাটা ফোর্ট উইলিয়ামের বাংলার কাছে পদানত হয়। পূর্ব বাংলার বাঙালি মধ্যবিত্ত এখন ঈশ্বরচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মগজ দিয়ে চিন্তা করে এবং কলকাতার বাংলাকে প্রমিত বাংলা হিসেবে প্রণতি জানায়। যার ফলাফল হিসেবে আমরা দেখতে পাই ঢাকায় বসেই কলকাতার বাঙালির রিসাইক্লিং চলছে এবং এই বাঙালি কলকাতার সাংস্কৃতিক উপনিবেশের অধস্তন অংশীদার হিসেবে লিপ্ত রয়েছে। এইভাবে পূর্ব বাংলার মানুষ দুইবার উপনিবেশায়নের মুখোমুখি হয়। প্রথমবার ইংরেজের রাজনৈতিক উপনিবেশের ধাক্কা খায়, দ্বিতীয়বার কলকাতার সাংস্কৃতিক উপনিবেশের তলায় তলিয়ে যায়। এই দুইবারের উপনিবেশায়ন বাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক মেরুদণ্ড দুর্বল করে দেয়।

বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতার লক্ষণ আজ যে এত প্রবলভাবে পরিস্ফুট, তার গোড়া খুঁজতে হবে এখানে। কারণ, বাঙালি জাতীয়তাবাদ বাংলাদেশের কোনো জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। শুধু বাংলাদেশেই নয়, পুরো মুসলিম জগতের এই বেহাল অবস্থা। এই অবস্থাটাকে সালমান সাঈদ বলেছেন কামালবাদ।[৩] কামালবাদ হচ্ছে মুসলিম জগতের সেকুলারায়নের

অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। কামালবাদ শব্দটা নেওয়া হয়েছে তুরস্কের কামাল পাশার প্রবর্তিত ভাবধারা থেকে। যাইহোক, সেকুলারিজম পশ্চিমা জগতে সৃজনশীলতার বান আনলেও মুসলিম জাহানে তৈরি করেছে হীনম্মন্য পরানুখ প্রজন্ম। এরা নিজের চোখে নিজের ইতিহাস দেখে না। অন্যের চোখে নিজের চেহারা দেখে আঁতকে ওঠে। এক গাছের ছাল অন্য গাছে লাগালে সব সময় প্রত্যাশিত ফলাফল দেবে এমন কোনো কথা নেই।

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অনন্ত যুদ্ধের কালে সেকুলারিজম তার রূপ বদলেছে। ওয়েন্ডি ব্রাউন দেখিয়েছেন, সেকুলারিজম এখন সাম্রাজ্যবাদী প্রকল্পের অংশ হিসেবে কাজ করছে।[৪] এই চিন্তাটিকে সাবা মাহমুদ আরও সম্প্রসারিত করেছেন এবং দেখানোর চেষ্টা করেছেন, সাম্রাজ্যবাদ পুরো মুসলিম জগতের কর্তাসত্তাকে সেকুলার ও লিবারেল লাইনে প্রবাহিত করতে চায় এবং মুসলিম জগতে এখন সেকুলারিজম ও সংস্কার মানে হলো এক প্রকার সাম্রাজ্যবাদী বয়ানের অংশ। এতে মনে করার সংগত কারণ আছে, যারা মুসলিম জগতে এখন উদারনৈতিক ইসলামি সংস্কারের কথা বলছেন, তারা সাম্রাজ্যবাদী প্রকল্পের অংশ হয়েই সেটা করছেন। মাহমুদ আরও দাবি করেছেন, সাম্রাজ্যবাদ ইসলামের ভেতরে একটা সেকুলার ধর্মের উত্থান চায়। কেননা, এতে ইসলাম আরও গণতান্ত্রিক ও পশ্চিমের জন্য কম হুমকি হয়ে উঠবে। এই প্রকল্পে ধর্মকে ততটুকুই গ্রহণ করা হবে, যতটুকু এটা উদারনৈতিক মূল্যবোধ আত্মস্থ করতে পারে।[৫]

সুতরাং সেকুলারিজম বড়ো রকমের প্রত্যাশা তৈরি করতে পারে—এটা একটা অমূলক ধারণা। বিশেষ করে সেকুলারিজমকে গ্রহণশীল মন নিয়ে বিবেচনা করা একালে একটা আত্মঘাতী কাজ বৈ অন্য কিছু নয়।

তথ্যসূত্র :

১. হুমায়ুন কবির, *বাংলার কাব্য*। ঢাকা : খান ব্রাদার্স এন্ড কোং, ১৯৭০।
২. হুমায়ুন কবির, *বাংলা ভাষা ও মুসলমান সাহিত্য*, মোহাম্মদী, ১৩৪১, জ্যৈষ্ঠ।
৩. S. Sayyid, *Recalling the Caliphate*. London : Hurst and Company, 2014.
৪. Wendy Brown, 'Idealism, Materialism, Secularism', Immanent Frame. Retrieved from : http: //blogs. ssrc.org/tif/2007/10/22/ idealism-materialism-secularism'.
৫. Saba Mahmood, 'Secularism, Hermeneutics and Eupire : The Politics of Islamic Reformation', Public Culture, 18 (2), PP. 323-347, 2006.

সৈয়দ মুজতবা আলী : জাতীয়তাবাদের দোলাচল

সৈয়দ মুজতবা আলী কীর্তিমান হয়েছেন তার *দেশে বিদেশে* বইটির জন্য। অদ্ভুত সরেস, জীবন্ত ও মজলিসি মেজাজে লেখা এই ভ্রমণকাহিনি বাংলা ভাষার রীতিমতো তুলনাহীন। এই একটি ক্ষেত্রে আলী সাহেবের তুলনা আলী সাহেব নিজেই। এ কথা চোখ বুজে দ্বিধাহীনভাবে বলে দেওয়া যায়, *দেশে বিদেশে*-ই হচ্ছে আলী সাহেবের শ্রেষ্ঠতম সাহিত্য কীর্তি। আলী সাহেবের বর্ণনার অসাধারণত্ব এবং তার নানা রকমের শব্দ ব্যবহারের অদ্ভুত চমক এ বইতে রোশনাই হয়ে ফুটে উঠেছে এবং তার এই জাদুকরি শব্দবিন্যাস পাঠকের বোধে রীতিমতো কাঁপন লাগিয়ে যায়।

দেশে বিদেশে বইয়ে মুজতবা আলীর বর্ণনার ঢংটি তার একান্তই নিজস্ব। তিনি তার নিজস্ব মজলিসি ও আয়েশি ভঙ্গিতে কথা বলে যান এবং অতি সহজে পাঠকের মনে গভীর এক ছাপ ফেলেন। বিশেষ করে চরিত্র চিত্রাঙ্কনে তার জুড়ি মেলা ভার। এক অবিস্মরণীয় ঔজ্জ্বল্যে তার চরিত্রগুলো ফুটে ওঠে। *দেশে বিদেশে* পড়ার সময় মনে হয়, পাঠক যেন নিজেই আলী সাহেবের হাত ধরে কাবুলের বাজারে পরিভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছেন। তার বর্ণনার সাথে পাঠকের এই একাত্মবোধই প্রমাণ করে, আলী সাহেব পাঠকের চিত্তে রস সৃষ্টিতে ওস্তাদ এবং সেই রসপানে পাঠকও একেবারে মশগুল হয়ে যান।

কাবুল বাজারের জীবন্ত ছবি, বৃদ্ধ ওস্তাদের গাওয়া গজল, বাদশাহ আমানুল্লাহর সংস্কারের কেচ্ছা, বাচ্চায়ে শকাওয়ের কাবুল দখল, একের পর এক ঘটনা ও দৃশ্য পাঠকের বোধকে দীপ্ত করে তোলে। তারপর পেশওয়ারের আহমদ আলী, কাবুলের দোস্ত মোহাম্মদ, পণ্ডিত মীর আসলম, অধ্যাপক খোদা বকশ, শান্তিনিকেতন থেকে আমদানি হয়ে আসা তিন বন্ধু বগদানফ,

বেনোয়া ও মৌলানা জিয়াউদ্দীন, সোভিয়েত দূতাবাসের দেমিদফ—কাকে ছেড়ে কার কথা বলব। প্রত্যেকটি চরিত্রই স্বকীয় ও উজ্জ্বল এবং প্রত্যেকটি সমানভাবে মনের দুয়ারে ছাপ রেখে যায়। এসব চরিত্রের মধ্যে সবচেয়ে গভীর ও উজ্জ্বলতর হচ্ছে আলী সাহেবের ভৃত্য আবদুর রহমান, যাকে তিনি পরমাত্মীয়ের মর্যাদা দিয়েছেন। আবদুর রহমান সম্পর্কে তার শেষ বর্ণনাটি তুলনাহীন। আবদুর রহমানের খাবার পরিবেশনের স্টাইলটি সম্পর্কে আলী সাহেব লিখেছিলেন, এ যেন সুস্বাদু হাফিজের এক গজল। আমার মনে হয়, নিজের ভৃত্য সম্পর্কে বিদায়কালে তার মন্তব্যটিও হয়ে উঠেছে হাফিজের অন্য এক গজলের সাথেই তুলনীয়। আমি যথাস্থান থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

> 'তাকিয়ে দেখি দিগ্‌দিগন্ত বিস্তৃত শুভ্র বরফ। আর অ্যারফিল্ডের মাঝখানে, আবদুর রহমানই হবে, তার পাগড়ির ন্যাজ মাথার ওপর তুলে দুলিয়ে দুলিয়ে আমাকে বিদায় জানাচ্ছে। বহুদিন ধরে সাবান ছিল না বলে আবদুর রহমানের পাগড়ি ময়লা। কিন্তু আমার মনে হল চতুর্দিকের বরফের চেয়ে শুভ্রতর আবদুর রহমানের পাগড়ি আর শুভ্রতম আবদুর রহমানের হৃদয়।'[১]

দেশে বিদেশে-এর আরেকটি বৈশিষ্ট্য না বললেই নয়। আলী সাহেবের তুলনাহীন বর্ণনার সাথে তার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বিচিত্র রকমের জ্ঞানের এক বারোয়ারি বাজার হচ্ছে এ বই। কত রকমের শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে যে তিনি এখানে উদ্ধৃতি দিয়েছেন আর কত কবির রচনা যে তার মুখস্থ, এর যেন কোনো ইয়ত্তা নেই। তারপর ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান—কত রকমের জ্ঞানের শাখা-প্রশাখায় তিনি যে বিচরণ করেছিলেন, এর একটা নমুনা আন্দাজ করা যায় এ বইয়ে। *দেশে বিদেশে*-এর পৃষ্ঠাগুলোতে আলী সাহেবকে আমরা পাই পণ্ডিত, রসিক, আয়েশি, মজলিসি, সদাহাস্যময় এক শিল্পী হিসেবে।

দেশে বিদেশে তার প্রথম প্রকাশিত বই। কিন্তু এখানে আলী সাহেবকে আমরা যেভাবে পাই, তার পরবর্তী লেখাগুলোতে একই রকম মননশীলতা ও জীবন সম্পর্কে গভীর উপলব্ধিগত তেমন কিছু পাই না। তার দুয়েকটি উপন্যাস বা ছোটোগল্পে তার সেই মননজাত নির্যাস কিছুটা চমকে উঠলেও সুপণ্ডিত আলী সাহেব পুরোপুরিভাবে নিজেকে আর কোথাও উন্মোচিত করতে পারেননি। মনে হয় জীবনকে তিনি এক লঘু হাস্যরস ও আয়েশি আমেজের মধ্যেই কাটিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এই ইচ্ছেটাই বোধ হয় তার সাহিত্যিক জীবনের জন্য এক অর্থে দুরপনেয় ট্রাজেডির কারণ হয়ে উঠেছে।

জীবন আর লেখালেখিকে হাস্যকোলাহল, কল্লোল ও কলরবের মধ্যে প্রবাহিত করতে চেয়েছিলেন বলেই মনীষার উৎকর্ষতা তার জীবনে পুরোপুরি ঘটেনি। তার যে বিপুল পাণ্ডিত্য ছিল এবং বিচিত্র রকমের জ্ঞানের সমাহারে তার অভিজ্ঞতার পাত্র যেভাবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, তার সঠিক ব্যবহার ও পরিমার্জনায় তিনি বাংলা সাহিত্যের দরবারে আরও ওপরে অনায়াসে জায়গা করে নিতে পারতেন।

তার মতো প্রতিভাধরের জন্য নিদেনপক্ষে বুদ্ধিজীবী হিসেবে অন্নদাশংকর রায় কিংবা কথাশিল্পী হিসেবে তারাশঙ্কর বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হওয়া আদৌ কোনো ব্যাপার ছিল না। কিন্তু আলী সাহেবের দুর্ভাগ্য হলো, সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি স্রেফ একজন রম্য লেখক হিসেবেই রয়ে গেলেন! হয়তো অনেকে বলতে পারেন, সাহিত্যের জগতে এ রকম তুলনা কি খাটে? কারণ, প্রতিভার বিকাশ তো বিচিত্রভাবে ঘটে এবং প্রত্যেকেই আপন আপন স্বভাব ও লক্ষণ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। কথাটা পূর্ণ সত্য নয়। কারণ, যথেষ্ট মনীষার উপস্থিতি সত্ত্বেও কারও যখন যথাযথ বিকাশ ঘটে না, তখন আমাদের মধ্যে তুলনার আকাঙ্ক্ষা জাগে। আলী সাহেবের ক্ষেত্রেও হয়েছে তাই। তিনি বিস্তর লিখেছেন। এর মধ্যে ফরমায়েশি লেখার পরিমাণও অজস্র। তার লেখা থেকে জানা যায়, পয়সার জন্যও লিখেছেন তিনি। এই অজস্রপ্রসূ লেখক লিখতে গিয়ে চিন্তা করেননি—তিনি কী লিখছেন, তার লেখার মর্যাদা ও উৎকর্ষতা যথাযথ রক্ষিত হচ্ছে কি না। নিজের লেখা নিয়ে এই অবহেলার পশ্চাতে আছে আলী সাহেবের বিশিষ্ট মানসিকতা এবং এই মানসিকতা তার অজ্ঞাতে তৈরি হয়েছে তার সমাজ, পরিবেশ ও শিক্ষার ভেতর দিয়ে। তার প্রতিভার অপচয় হয়েছে, কিন্তু প্রতিভার তুল্য সৃষ্টি বের হয়ে আসেনি। আমার মনে হয়—যে সমাজ ও পরিবেশ আলী সাহেবকে লালন করেছে, তা তার সৃষ্টিকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ না করে উলটো লাঞ্ছিত করেছে। বিষয়টি আরেকটু আলোচনা করা যাক।

আলী সাহেব খুব অল্প বয়সে শান্তিনিকেতনে পড়তে গিয়ে রবীন্দ্র সান্নিধ্যে এসেছিলেন। এটি তার মধ্যে সৃষ্টি করেছিল রবীন্দ্রানুগত্য ও রবীন্দ্রপূজার অন্তর্দৃষ্টি। তার হাড়ে মজ্জায় রবীন্দ্র সাহিত্য এমন গভীরভাবে মিশে গিয়েছিল যে, তার মানস জগৎও তৈরি হয়েছিল রবীন্দ্র সংস্কৃতির বাঁধানো ফ্রেমে। তার চিন্তা ও অনুভূতি প্রকাশ পেত রবীন্দ্র সাহিত্যের রসধারায়। আলী সাহেবের লেখালেখিতে তার গুরুদের রবীন্দ্রনাথের এই প্রভাব ভয়ানক রকমভাবে দৃশ্যমান। কিন্তু এটা তো অস্বীকার করা যাবে না যে,

রবীন্দ্র সংস্কৃতি হচ্ছে প্রাচীন ভারতীয় পৌরাণিক সংস্কৃতিরই একটি আধুনিক সুমার্জিত রূপ, যার ওপরে একটুখানি পশ্চিমি সংস্কৃতির প্রলেপ পড়েছিল মাত্র। এই রবীন্দ্র সংস্কৃতির প্রতি নির্জলা আনুগত্য আলী সাহেবকে তার বিরাট বিশাল ইসলামি ঐতিহ্যের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল।

নিজের সংস্কৃতির প্রতি অনীহা, আর অন্যের সংস্কৃতির প্রতি আনুগত্যের ভেতর দিয়ে উজ্জ্বল মনীষাও কখনো কখনো মরুভূমিতে পরিণত হয়। আলী সাহেবের ক্ষেত্রে কথাটা অনেকখানি সত্য। বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আলী সাহেব তার দেশের মানুষ, আরও বিশেষ করে বললে তার বিপুল স্বধর্মীর জন্য তেমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেননি। স্বদেশ আর স্বসংস্কৃতি থেকে উন্মূল হয়ে গেলে যা হয়, আলী সাহেব তার বড়ো প্রমাণ। অনেকে বলতে পারেন, তার লেখায় তো বিপুল পরিমাণ আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। এগুলো তো মুসলিম ঐতিহ্য থেকেই পাওয়া। খুবই খাঁটি কথা। এই ঐতিহ্যের ব্যবহার তার লেখালেখি বিশেষ করে *দেশে বিদেশে*-কে সমৃদ্ধ করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার অন্তর্শক্তি ও মানসজগৎ রবীন্দ্রানুগত্যের কাছে রীতিমতো শুকিয়ে ও হাঁপিয়ে উঠেছিল। এর ফলে তার সৃষ্টিশীলতা ও মননশীলতার প্রচুর ক্ষতি হয়েছিল। সৃষ্টিশীলতার জন্য স্বাধীনতা দরকার। আনুগত্যও চাই, তবে তা স্বসংস্কৃতির আনুগত্য।

আলী সাহেবের রবীন্দ্রানুগত্য তার সংস্কৃতি চিন্তা ও জাতীয়তাবাদ চিন্তাকেও প্রভাবিত করে। দেশভাগের পর তিনি ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। অবশ্য স্বল্প সময়ের জন্য তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে এসে চলমান রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পক্ষে তিনি একটা লেখা লেখেন, যা কলকাতার চতুরঙ্গ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এটা একটা অবাক করা কাণ্ড। যে আলী সাহেবের পাকিস্তান রাষ্ট্রের ব্যাপারে আদৌ কোনো আগ্রহ ছিল না, যে রাষ্ট্রটির প্রতিষ্ঠার পক্ষে তিনি ছিলেন না, তার রাষ্ট্রভাষা নিয়ে তিনি এতখানি বিচলিত হলেন কেন? তাহলে কি তখনকার পাকিস্তানপন্থিরা তাকে যে ভারতের দালাল বলে কটূক্তি করেছিল, তার মধ্যে কোথাও কোনো সত্যতা লুকিয়ে ছিল?

আলী সাহেব পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবি করেছিলেন, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান থেকে ফিরে যেয়ে কখনো ভারত তো দূরে থাক, পশ্চিম বাংলার রাষ্ট্রভাষা বাংলা হোক—এ কথা দাবি করাটাও তার সাহসে কুলোয়নি। তার তো ভালো করেই জানার কথা, তার গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে হিন্দির জন্য সুপারিশ করেছিলেন। হয়তো সেই

ভয়-কাতরতা থেকেই তিনি আর ভারতে বা পশ্চিম বাংলায় বসে বাংলার কথা মুখে আনেননি। বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও পরিব্যাপ্তি যদি হয় তার ধ্যানের বাংলার মনশ্ছবি, তবে তিনি পূর্ব বাংলার মতো পশ্চিম বাংলার রাষ্ট্রভাষা হিসেবে কেন বাংলার দাবি করেননি? এই ফাঁকটা না ধরতে পারলে আলী সাহেবের জাতীয়তাবাদ চিন্তার গলদ ধরা যাবে না। আলী সাহেব একবার তার রায় পিথৌরা নামক কলামে লিখেছিলেন—'বাঙালির এ কথা ভুললে চলবে না, সে বাঙালি। সে হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, খ্রিস্টান নয়, সে বাঙালি।'

এই বাঙালির চরিত্র ও পরিচয় স্পষ্ট নয়, অস্বচ্ছ। এই অস্বচ্ছতার পর্দা দুলিয়ে ওপারের রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা এপারের কৃষিজীবী মুসলমানদের জাতীয়তার পরিচয়কে বহুবার সংশয়িত করে তুলেছেন এবং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে ঠকানোরও কম চেষ্টা করেননি। আলী সাহেবের এ বক্তব্য তারই প্রতিধ্বনি বলে মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথ, আলাউদ্দীন খাঁ, রবিশংকর, সত্যজিত রায়, মৃনাল সেন প্রমুখ প্রথিতযশা কবি, শিল্পী ও কলাবিদেরা পৃথিবীব্যাপী খ্যাত হয়েছেন ভারতীয় পরিচয়ে, বাঙালি হিসেবে নয়। তারা আজ বিশাল ভারতীয় ঐতিহ্যের গর্বিত অংশীদার। সাংস্কৃতিক চেতনার দিক দিয়ে এই ভারতীয়তা আর হিন্দুত্ব সমার্থক জিনিস। আবার তাদের বাঙালিত্ব আর ভারতীয়তাও একই জিনিস, একেরই দুই ভিন্ন প্রকাশভঙ্গি। এখন এই সব প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিদের বাঙালিত্বের চেতনা আর আমরা যারা পূর্ব বাংলার অধিবাসী তাদের বাঙালিত্বের চেতনা কি একই রকম? এই দুই ঐতিহ্যের ধারা কি একই ধারা হওয়া সম্ভব? আলী সাহেব যে সেকুলার অসাম্প্রদায়িক সমন্বয়ধর্মী বাঙালি জাতীয়তাবাদের কথা বলেন, তার প্রকাশ কোথায়? মূলত এটি তার রোমান্টিক মনের মিথস্ক্রিয়ার ফল। এর বাস্তব ভিত্তিও দুর্বল।

এই যে আলী সাহেব আজীবন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সেবা করলেন, তার বিপুল মনীষা ও পাণ্ডিত্যের শক্তি দিয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিতকে মজবুত করার জন্য প্রাণপাত করলেন, তার ফল কী হয়েছে? তার মতো রবীন্দ্র অন্তঃপ্রাণকেও পাকিস্তানের চর সন্দেহে শেষ বয়সে শান্তিনিকেতন থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাকে সাম্প্রদায়িক বলে তার শান্তিনিকেতনের চাকরি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। হুমায়ুন কবিরের মতো ব্যক্তিও নিজে হস্তক্ষেপ করে তার চাকরি বাঁচাতে পারেননি। সাহিত্য প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ

ওখানে তার কোনো পুরস্কারও মেলেনি। একই জীবনে তিনি পূর্ব বাংলায় ভারতের দালাল আর পশ্চিমবঙ্গে পাকিস্তানের চর হওয়ার গৌরব (?) অর্জন করলেন! একি তার ট্রাজেডি?

শেষ বিচারে আলী সাহেব পূর্ব বাংলারও হলেন না, পশ্চিম বাংলারও না। তার মানে না ঘরকা না ঘটকা। স্বসংস্কৃতি থেকে বিচ্যুত হওয়ার পরিণাম কি এই? *দেশে বিদেশে*-র একজন বিমুগ্ধ পাঠক হিসেবেও আলী সাহেবের এই রকম জাতীয়তাবাদ চিন্তার ত্রুটি বিচ্যুতির কথা না স্বীকার করে পারছি না।

আলী সাহেবের শেষ জীবন খুব দীনহীনভাবে কেটেছিল। আর্থিক সংকট, বন্ধুবান্ধবের অবহেলা তার জীবনকে দুর্বিষহ করে ফেলেছিল। যে শান্তিনিকেতন ছিল তার জীবনের সবচেয়ে বড়ো তীর্থস্থান, সেখান থেকে তাড়া খেয়ে, চাকরি হারিয়ে, সাম্প্রদায়িক আখ্যা পেয়ে তিনি মুষড়ে পড়েছিলেন। সে সময়কার তার মনের অবস্থা বোঝা যাবে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা তার এক চিঠি থেকে—

> 'শান্তিনিকেতনে ভদ্র লোকের পক্ষে থাকা অসম্ভব (আমি সর্ব সম্পর্ক ছিন্ন করে দূরে বোলপুর শহরে থাকি)। ওদের কালোবাজারের সামনে মারোয়াড়ি লজ্জায় ঘোমটা টানে।...
>
> বিশ্ব ভারতীর পাঠকদের দিয়ে আমি তিন দিনের ভেতর 'বাপ্পো বাপ্পো' রব ছড়াতে পারি। কিন্তু ইনডাইরেক্টলি বিশ্বভারতীকে 'hurt' করতে মন যায় না। আর লড়ব কার সঙ্গে? এরা পারে দুছত্র বাংলা লিখতে। কী উত্তর দেবে? তবে হ্যাঁ, ওদের চামড়াটি আল্লার 'কেরপায়' গন্ডার।...'[২]

অনেক কষ্ট বুকে চেপে বাংলাদেশ হওয়ার পর তিনি এখানে চলে আসেন এবং এখানকার নাগরিকত্ব নেন। কিন্তু এতে তার চিন্তার শান্তিনিকেতনী কাঠামোর মধ্যে কোনো পরিবর্তন হয়নি। এখানে তখন নতুন দেশে বাঙালি জাতীয়তাবাদের নামে উগ্র সেকুলার ধর্মবিদ্বেষী হাওয়া বইছে। এই পরিবেশের মধ্যে মুসলিম জাতিবাদবিরোধী আগুনে তিনি হাওয়া দেওয়া শুরু করেন। তিনি ইকবালের মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তাকে কঠোরভাবে আক্রমণ করেন। শুধু তাই নয়, তিনি ইকবালকে ব্যক্তিগতভাবেও আক্রমণ করেন এবং তাঁর উম্মাহ ও মিল্লাত চেতনাকে না বুঝে সাম্প্রদায়িক হিসেবে আখ্যা দেন। শুধু তাই নয়, পাকিস্তান ঘৃণার আড়ালে মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রিক চেতনা ও জীবনবোধকে কটাক্ষ করতেও তার বাধে না।[৩]

এই সাম্প্রদায়িকতার বয়ানটা তৈরি হয় উনিশ শতকের কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু এলিটদের হাতে, যারা এই বয়ানকে ব্যবহার করে পূর্ব বাংলার কৃষিজীবী মুসলমানদের দাবিয়ে রাখতে চেয়েছিল। পাকিস্তান হওয়ার পর জমিদারি হারানো হিন্দুবাবুরা রাতারাতি বামপন্থি দলে ভিড়ে এই বয়ানকে আরও স্ফীত করে তোলে এবং মুসলিম স্বাতন্ত্র্য চেতনাকে সাম্প্রদায়িক হিসেবে ব্যাখ্যা করে। আলী সাহেবের প্রথম জীবনে পাওয়া রাবিন্দ্রীক দীক্ষা তাকে একজন হীনম্মন্য বাঙালি মুসলমানের মতো এই সাম্প্রদায়িক বয়ানের গ্রাহক বানিয়ে ফেলে। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তার দিক দিয়ে তিনি আমৃত্যু এই গ্রহীতার জীবনই কাটিয়ে গেছেন।

হদিস

১. সৈয়দ মুজতবা আলী, *দেশে বিদেশে*, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, দশম খণ্ড। কলিকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., ১৪০১, পৃ. ৮১।

২. বিজন বিহারী পুরকায়স্থের লেখা 'সৈয়দ মুজতবা আলী' অবলম্বনে সৌম্যদীপ গোস্বামী, প্রহর.ইন, সেপ্টেম্বর ১৩, ২০২০।

৩. সৈয়দ মুজতবা আলী, *উভয় বাঙলা নীলমনি*, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড। কলিকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., ১৪০২, পৃ. ৩২৩।